কামানের ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। ফাঁকা আওয়াজে কাহারও কোন অনিষ্ট না হওয়ায় তিতুর লোকজনের সাহস বাড়িয়া গেল। তিতুর সহকারী মিস্কিন ফকির সগর্ব্বে হাসিয়া বলিলেন, "গোলা খা ডালা" অর্থাৎ কামানের গোলা আমি খাইয়া ফেলিয়াছি। তিতুর অজ্ঞ অনুচরগণ তাঁহার অলৌকিক শক্তি আছে মনে করিয়া আরও উৎসাহিত হইয়া সরকারী ফৌজের উপর ইট পাথর প্রভৃতি ছুড়িতে লাগিল, তখন কর্ণেল সাহেব গোলা-ভরা কামান দাগিবার হুকুম দিলেন। মূহুর্ত্তের মধ্যে গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল এবং তিতুর বহু অনুচর হত ও আহত হইল। স্বয়ং তিতুমীরও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার সেনাপতি মাসুমের সহিত ৩৫০ জন লোক বন্দী হইল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৪০ জন লোকের কারাদণ্ড হয় এবং তিতুর সেনাপতি মাসুমকে বাঁশের কেল্লার সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিস্কিন ফকির কোথায় অন্তহিত হইয়াছিলেন। পরে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার আর খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

গোবরডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূর। এই গ্রামটি অধুনা শীর্ণকায়া যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন কুশদ্বীপ বা কুশদহের অন্তর্গত। এখানে মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী এক ঘর প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। আনন্দময়ী বাটী নামক দেবালয় এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে গোবরডাঙ্গার জমিদার বাটীতে গোষ্ঠবিহার নামে একটি মেলা হয় এবং উহা দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। একটি খোয়াড়ের মধ্যে একটি গাভী ও একটি শূকর শাবককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গাভী ও শূকর শাবকটি পরস্পারের ভয়ে ছুটাছুটি করিতে থাকে। গাভী কর্ত্তৃক শূকর শাবককে দংশন না করা পর্য্যন্ত এই ক্রীড়া চলিতে থাকে।

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী ইছাপুর গ্রামে হড় চৌধুরীদের একটি প্রাচীন ও বৃহৎ নবরত্ন মন্দির ও জোড়-বাংলা আছে। গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ রেলওয়ে সেতুর দক্ষিণে যমুনার উপর প্রতাপপুর নামক স্থান প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। কথিত আছে, ইছাপুরের হড় চৌধুরী বংশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের উপর কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্য সসৈন্যে আসিয়া যমুনার ধারে ছাউনী করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নাকি দৈববলে প্রতাপাদিত্যের ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া নিজ হাতে রাজার পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। প্রতাপ প্রীত হইয়া যখন প্রশ্ন করেন কে এই সকল বন্দোবস্ত করিয়াছে, তখন পণ্ডিত মহাশয় আত্ম পরিচয় দেন। তখন তাঁহদের মিটমাট হইয়া যায়। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তখন রাজাকে আহারাদি করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে পররাজ্যে তিনি অন্ন গ্রহণ করেন না। পণ্ডিত মহাশয় তখনই দলিল করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ছাউনীর স্থানটি প্রদান করিয়া আতিথ্যে আপ্যায়িত করেন। তখন হইতে স্থানটি প্রতাপপুর নামে খ্যাত হয়। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পৌত্র রঘুনাথের সময় ইছাপুরের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাম্য কাহিনী এ অঞ্চলটিকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করিয়াছে, এই স্থানেই নাকি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধেনু চরাইতেন।

গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গৈপুর গ্রামে ওলাবিবির দরগা নামে এক দেবস্থান আছে। ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে এখানে পূজা ও তিন দিনব্যাপী মেলা হয়। গৈপুর গোপিনীদের বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত; নদীর অপরপারে গোপিনীপোতা এবং পার্শ্বস্থ একটি গ্রামের নাম কানাই নাটশাল হইতে গ্রাম্য কাহিনীর সম্পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোবরডাঙ্গার দক্ষিণদিকস্থ চারঘাট নামক স্থানে যমুনাগর্ভে "হরে শুঁড়ীর দহ" ও নদী তীরে পীর ঠাকুরবরের আস্তানা আছে। পীর ঠাকুরবর প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। (লাউজানি দ্রষ্টব্য।) তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসীর মত গোপনে সাধন ভজন করিতেন; সেই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল পীর ঠাকুরবর। তাঁহার সমাধিস্থানে প্রত্যহ সকালে মুসলমান সেবায়েৎ ফুল ও বেলপাতার অর্ঘ্য প্রদান করেন। কথিত আছে হরেকৃষ্ণ সাহা বা "হরে শুঁড়ী" নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন; কিন্তু পরে গর্ব্বিত হইয়া পীর সাহেবকে অশ্রদ্ধা করেন। তাঁহার অভিশাপে হরে কৃষ্ণ সাহা নৌকা সমেত যমুনা গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় তদবধি উক্ত স্থান "হরে শুঁড়ীর দহ" নামে পরিচিত হয়।

গোবরডাঙ্গার চার মাইল পূর্ব্বে দেয়াড়া নামক স্থানে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় এক বিরাট মেলা বসে এবং গঙ্গা ও যমুনার প্রতিমূর্ত্তির পূজা হয়। এই মেলায় প্রায় ১০।১৫ হাজার যাত্রী যোগদান করে। লোকের বিশ্বাস যে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই স্থানে গঙ্গা ও যমুনার মিলন হয় এবং এই স্থানে ঐদিন স্নান করিলে গঙ্গা ও যমুনা এই দুই পুণ্যতোয়া নদীতে স্নানের ফল লাভ করা যায়।

গোবরডাঙ্গা হইতে প্রায় ছয় মাইল পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে জলেশ্বর নামক স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে এক বিরাট মেলা হয় এবং উহাতেও প্রায় ১০।১২ হাজার যাত্রী যোগদান করে। এই মেলা বুড়া শিবের মেলা নামে পরিচিত। এখানে একটি বৃহৎ দীঘি আছে। প্রবাদ যে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দীঘি হইতে একটি প্রকাণ্ড চড়ক গাছ ও একখণ্ড প্রস্তর আপনা হইতেই ভাসিয়া উঠে এবং পূজা ও মেলা শেষ হইবার পর আবার দীঘির জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

গোবরডাঙ্গার দুই স্টেশন পূর্ব্ববর্ত্তী হাবড়া নামক স্টেশন হইতেও গরুর গাড়ীতে করিয়া জলেশ্বরে যাওয়া যায়।

বনগ্রাম জংশন—কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূর। ইহা যশোহর জেলার একটি মহকুমা। বনগ্রাম শহরটি ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে ইছামতী নদীর উপর একটি ভাসমান সেতু আছে।

ইছামতী নদীর উপরকার রেলওয়ে সেতুর অতি নিকটে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রবাদ পূর্ব্বে এই অশ্বত্থতলায় "ডাকাতে কালী" নামে এক কালী প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। ডাকাতেরা নাকি ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই কালীর পূজা করিয়া বাহির হইত এবং সুযোগ পাইলে এখানে নরবলি দিত।

বনগ্রাম জংশন হইতে একটি শাখা লাইন রাণাঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

বেনাপোল—কলিকাতা হইতে ৫৩ মাইল দূর। স্টেশন হইতে মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে "যশোর রোড" নামক প্রশস্ত রাজবর্ত্মের পার্শ্বে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ "যবন হরিদাস" বা হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ও তুলসী মঞ্চ অবস্থিত। এখানে একটি মন্দির মধ্যে নিতাই, গৌর ও হরিদাস ঠাকুরের দারুময়ী মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখেই তুলসীমঞ্চ অবস্থিত। দোলযাত্রার সময় এখানে মহোৎসব হয় ও তদুপলক্ষে প্রায় চার পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।



হরিদাস ঠাকুরের তুলসীমঞ্চ, বেনাপোল

জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বুঢ়ন পরগণার অন্তর্গত স্বর্ণ নদীর তীরবর্ত্তী ভাটকলাগাছি নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। অনেকের অনুমান যে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত কলাগাছি বা "কেঁড়াগাছি" নামক গ্রামই হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ভাটকলাগাছি গ্রাম। কোন এক বিপ্লবের ফলে অতি শিশুকালেই হরিদাস পিতামাতাকে হারাইয়া স্থানীয় কাজীর গৃহে লালিত পালিত হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং তিনি পালক পিতার গৃহত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। লোকে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই জানিত। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে অনুমিত হয় যে হরিদাস মুসলমান বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর তিনি বেনাপোলের এক জঙ্গল মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক তুলসী মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন ও "রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন" করিতে থাকেন। তাঁহার এইরূপ অপূর্ব্ব সাধনার পরিচয় পাইয়া স্থানীয় লোকজন তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার রামচন্দ্র খানের মনে বিশেষ ঈর্ষার সঞ্চার হয়। হরিদাসকে সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য তিনি নানারূপ অপচেষ্টা করেন।

কিছুকাল পরে ঠাকুর হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করেন। নবাবের কোপে পড়িয়া অত্যাচারী রামচন্দ্র খানের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। হরিদাসের পাট বাড়ীর অনতিদূরে রামচন্দ্র খানের গড়বেষ্টিত রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ অরণ্য সমাবৃত অবস্থায় আজিও বর্ত্তমান আছে। স্থানীয় লোকের নিকট ইহা "রাজবাড়ী" নামে পরিচিত। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে রামচন্দ্র খান কেবল মাত্র হরিদাস ঠাকুরকে নহে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকেও বিশেষ অসম্মান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খানের বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী দুই একটি প্রাচীন পুষ্করিণী এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ঝিকরগাছা ঘাট—কলিকাতা হইতে ৬৭ মাইল দূর। ইহা কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এইখানে একটি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেকেঞ্জি নামক জনৈক কুঠিয়াল এখানে একটি হাট বসান, উহা মেকেঞ্জিগঞ্জের হাট নামে পরিচিত। ঝিকরগাছার হাটে প্রচুর পরিমাণে তরীতরকারী, ডাল-কলাই ও গুড়ের আমদানি হয়। ঝিকরগাছার অপর পারে গবাদি পশুর ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আর একটি হাট আছে। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে ঝিকরগাছার বাজারে দোলযাত্রা উৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে এক পক্ষ স্থায়ী একটি মেলা বসে।

বোধখানা—ঝিকরগাছা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বোধখানা গ্রাম বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কানাই ঠাকুরের শ্রীপাট এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রাণবল্লভজীউর মন্দির ও বিগ্রহ বিদ্যমান। এখানে প্রতিবৎসর পঞ্চম দোল উপলক্ষে মেলায় মহাসমারোহ ও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। প্রবাদ, পঞ্চম দোলের দিন উষাকালে এখানকার একটি কদম্ব বৃক্ষে অকালে কদম্বফুল ফুটিয়া থাকে এবং উহা কর্ণে পরিধান করিয়া প্রাণবল্লভজীউ দোলমঞ্চে আরোহণ করেন।

অমৃতবাজার—ঝিকরগাছা হইতে চার মাইল উত্তরে অবস্থিত অমৃতবাজার গ্রামে সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। শিশিরকুমার ও তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতা মতিলাল প্রভৃতি মিলিয়া এই গ্রামের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই গ্রামের প্রকৃত নাম পলুয়া মাগুরা। ঘোষ ভ্রাতৃগণ গ্রামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের জননী অমৃতময়ীর নামানুসারে উহার নাম রাখেন অমৃতবাজার। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে শিশির কুমারের সম্পাদনায় অমৃতবাজার পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। পরে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ হইলে শিশির কুমার ইংরেজী ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মফঃস্বল হইতে সংবাদপত্র প্রকাশে নানারূপ অসুবিধা হওয়ায় অবশেষে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহার সমসাময়িক কালে শিশির কুমার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সংবাদপত্র সেবা, রাজনীতি চর্চ্চা, সাহিত্য সেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা, বাগ্মিতা—সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "অমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। শিশির কুমার ইংরেজী ভাষায় "লর্ড গৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

লাউজানি—ঝিকরগাছার পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত লাউজানি একটি প্রাচীন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানের পূর্ব্বনাম ব্রাহ্মণ নগর এবং এখানে রাজা মুকুট রায়ের রাজধানী ছিল। এই স্থানটি কপোতাক্ষ নদের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত এবং পূর্ব্বে ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া হরিহর নদ প্রবাহিত হইত। মাধবাচার্য্য ও কৃষ্ণরাম দাসের "রায় মঙ্গল" কাব্য এবং "কালুগাজী ও চম্পাবতী" নামক পুঁথি হইতে জানা যায় যে মুসলমান গাথা-সাহিত্যের অন্যতম নায়ক বিরাট নগরের অধিপতি সিকন্দর শাহের পুত্র গাজী সুন্দর বনের ব্যাঘ্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ নগর অধিকার করিয়া মুকুট রায়ের সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। মুকুট রায়ের সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণরায় গাজীর গতিরোধ করিবার জন্য প্রবল যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া সুন্দর বন অভিমুখে পলায়ন করেন এবং পরে গাজীর সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুন্দর বনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেন। দক্ষিণরায় পরে বনদেবতার পদে উন্নীত হন এবং নানা স্থানে তাঁহার পূজার প্রবর্ত্তন হয় ("ধপধপি" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। বিরাটনগর কোথায় তাহা নির্ণীত হয় নাই। গাথা সাহিত্যে গাজী সিকন্দর শাহের পুত্ররূপে বর্ণিত হইলেও কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁর পুত্র (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের "আদি সপ্তগ্রাম" স্টেশন দ্রষ্টব্য) এবং ইহার প্রকৃত নাম বরখান্ গাজী। গাথা সাহিত্যের নানা স্থানে ইনি বড় খাঁ গাজী নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের সাত পুত্র ছিল, এই সাত ভাইএর একমাত্র বোন ছিলেন চম্পাবতী। কেহ কেহ অনুমান করেন যে রূপ-কথায় উল্লিখিত "সাত ভাই চম্পা" ও এই চম্পাবতী অভিন্ন। মুকুট রায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সবংশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং গাজীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহ দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব পলাইয়া গিয়া গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী চারঘাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামদেব পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পীর ঠাকুরবর নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। (গোবরডাঙ্গা দ্রষ্টব্য)।

গাথা-সাহিত্যে গাজীকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবদূত বা ফেরেস্তাগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহায়, গঙ্গা, মহাদেব ও চণ্ডী প্রভৃতি হিন্দু-দেবদেবীগণ তাঁহার অনুকূল এবং এমন কি সুন্দরবনের বাঘ ও কুমীর পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞাবহ। আজিও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য গাজীর নামে "সিরণি" মানত করেন এবং এখনও বাংলার কোন কোন অঞ্চলে "গাজীর গীত" বা গাজীর মাহাত্ম্য সূচক পালা সাজসজ্জা সহকারে অভিনীত হয়।

সাগরদাঁড়ি—ঝিকরগাছাঘাট হইতে খুলনা জেলার অন্তর্গত কপিলমুনি নামক প্রসিদ্ধ স্থান পর্য্যন্ত একটী দেশীয় কোম্পানির স্টীমার যাতায়াত করে। এই স্টীমার পথে ঝিকরগাছাঘাট হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত কপোতাক্ষী তীরবর্ত্তী **সাগরদাঁড়ি** গ্রাম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। শিক্ষিত বাঙালীর নিকট মাইকেল মধুসূদনের পরিচয় অনাবশ্যক। বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক হিসাবে ও "মেঘনাদবধ" কাব্যের কবিরূপে তাঁহার নাম চিরদিনই বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। স্বীয় জন্মপল্লীর প্রান্তবাহিনী কপোতাক্ষী নদীকে তিনি

একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় অমর করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগী জনৈক সাহিত্যিকের উদ্যোগে এই কবিতাটি মর্ম্মরপ্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়া তাঁহার পৈতৃক ভবনের নিকটবর্ত্তী কপোতাক্ষীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বীয় সমাধি স্তম্ভের জন্য রচিত কবিতায়ও মাইকেল মধুসূদন আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষী তীরে জন্মভূমি"। এই নদীটি কপোতাক্ষ নদ রূপেও অভিহিত হয়। কপোতাক্ষীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি শিক্ষিত বাঙালীর নিকট সাহিত্য-তীর্থ রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রসিদ্ধ মহিলা কবি মানকুমারী সাগরদাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

কপিলমুনি—ঝিকরগাছা ঘাট হইতে কপিলমুনি স্টীমার পথে ৪০ মাইল। ইহাও কপোতাক্ষী তীরে অবস্থিত এবং একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে কপিলেশ্বরী নামে এক অতি প্রাচীন কালী আছেন। এই কালী কপিলমুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল হইতে এই কপিল মুনি পৃথক ব্যক্তি। প্রবাদ অনুসারে ইনি পুণ্ড্ররাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ভ্রাতা ছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ও তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই তিনি নিহত হন। পৌণ্ড্রকের ভ্রাতা কপিল আবাল্য বিষয় বিরক্ত ছিলেন। স্বীয় ভ্রাতা পৌণ্ড্রকের ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি পুণ্ড্র রাজ্য (বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গ) ত্যাগ করিয়া সুদূর দক্ষিণ দেশে আগমন করেন এবং স্বীয় নামে তথায় এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম হইতেই এই স্থানের নাম কপিলমুনি হয়। কপিলেশ্বরীর পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাইলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকেনজী নামক ইংরেজ জমিদার একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সাইক্লোনে এই মন্দিরটিও পড়িয়া যায় এবং কালীমূর্ত্তি এখন অন্য একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা।

প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে ১৩ দিন ব্যাপী একটি মেলা কপিলের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে; স্থানীয় লোকের বিশ্বাস কপিলের তপস্যাগুণে বারুণীর দিন এই স্থানে কপোতাক্ষী নদীতে গঙ্গা প্রবাহিতা হন। কপিলমুনির বাজার হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আগ্রা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে তিনটি অতি পুরাতন ঢিবি বা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে এইগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। একটি ঢিবিকে খুঁড়িয়া পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ আরও ঢিবি দক্ষিণে চাঁদখালি ও উত্তরে টালা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

কপিলমুনি গ্রামে জাফর আলি নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। প্রবাদ, ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনা কিছুকাল কপিলমুনিতে বাস করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী খুল্লনার খাল ও খুল্লনার পুল এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে বলিয়া কথিত।

যশোহর—কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল দূর। জেলার সদর শহর যশোহর বা যশোর ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। যশোহরের নীচে ভৈরবনদ একরূপ মজিয়া যাওয়ার ফলে শহরটির পূর্ব্ব সমৃদ্ধির আর কিছুই নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ

শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা বাংলার একটি প্রধান নদী ও বাণিজ্য পথ ছিল। তখন গঙ্গা—সরস্বতী, ভাগীরথী ও ভৈরব এই তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত ছিল। প্রথমে সরস্বতী ও ভৈরবই ছিল প্রধান বাণিজ্য পথ। ক্রমে গঙ্গার পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া যাইবার ফলে সরস্বতী মজিয়া আসে ও ভাগীরথী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি পর পর গঙ্গার প্রধান ধারা বহন করে; এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভৈরব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান শহরের অতি সন্নিকটে মুড়লী কসবা নামক স্থানে পুরাতন যশোহর অবস্থিত ছিল। মুড়লীতে গরীব শাহ ও বেহরাম শাহ নামক দুইজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। ইঁহারা বাগেরহাটের সুপ্রসিদ্ধ পীর খান জাহান অলির চেলা ছিলেন। আধুনিক সময়ে মুড়লীতে একটি সুন্দর ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর হইতে বর্ত্তমান যশোহর সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মুঘলেরা তাঁহার রাজ্যে যশোহর নামে একটি ফৌজদারি স্থাপন করেন এবং উহার সদর মুড়লী কসবায় স্থানান্তরিত করেন। যশোহর ফৌজদারির সদর শহর বলিয়া কালক্রমে মুড়লী কসবার নামই যশোহর হইয়া যায়। বর্ত্তমান যশোহর হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে **মির্জ্জানগরে** মুঘল ফৌজদারদের একটি বাসভবন ছিল। তথায় ফৌজদারদের একটি ভগ্ন প্রাসাদ ও একটি মস্‌জিদ আছে। প্রাসাদ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার নিকটবর্ত্তী মাঠে একটি পুরাতন কামান আছে।

যশোহর শহরের সংলগ্ন **চাঁচড়া** গ্রামে একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবেশ্বর রায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে সাহায্য করিয়া চারিটি পরগণার জমিদারি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর মনোহর রায় আওরঙ্গজেবের আমলে জমিদারি বিস্তর বাড়াইয়াছিলেন। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে চাঁচড়ার জমিদারগণ যশোহরের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবাটীর পরিখা ও প্রাচীন প্রাকারের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। চাঁচড়া গ্রামে দশ মহাবিদ্যার একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যার সুন্দর দারুময়ী মূর্ত্তিগুলি এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যশোহরে চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি নির্ম্মাণের কতকগুলি ছোট ছোট কারখানা আছে।

বারবাজার—যশোহর হইতে দশ মাইল উত্তরে যশোহর-ঝিনাইদহ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত বারবাজার একটি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রায় তিন চার মাইল ব্যাপী স্থানে বহু ভগ্নাবশেষ ও পুরাতন দীঘিকাদি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক্ ইতিহাস (Periplus of the Erythrean Sea) পেরিপ্লাসে বর্ণিত. গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। (বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ের দেগঙ্গা স্টেশন দ্রষ্টব্য)। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি ভার্জ্জিল তাঁহার "জর্জিকাস" নামক কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া একটি মর্ম্মর মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার শীর্ষদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিডি দিগের বীরত্বের কথা খোদিত করিবেন। ইহা হইতে গঙ্গারিডিগণের শৌর্য্য বীর্য্যের কথা প্রতীয়মান হয়। এখানকার ভগ্ন স্তূপগুলি প্রায় ১০।১২ ফুট হইতে ১৫।১৬ ফুট উচ্চ।

ইহাদের মধ্যে বহু পুরাতন ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার কতকগুলি প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিয়া মনে হয় যে সেগুলি বৌদ্ধ যুগের। হিন্দু ভাস্কর্য্য সমন্বিত কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই প্রাচীন শহরে বারটি বাজার ছিল বলিয়া ইহার বারবাজার নাম হয়। মতান্তরে এখানে বারজন ফকিরের আস্তানা থাকায় ইহার নাম হয় বারবাজার। এখানে রাজ-পথের দুই পার্শ্বে রাজমাতা দীঘি, সওদাগর দীঘি, পীরপুকুর, মীরের পুকুর, চেরাগদানি দীঘি, মনোহর পুকুর, কানাই দীঘি, বিশ্বাসের দীঘি, শ্রীরামরাজার দীঘি প্রভৃতি বহু দীঘি ও পুষ্করিণী আছে। জনশ্রুতি যে এই নগরে ১২৬টি দীঘি ছিল। শ্রীরামরাজার দীঘির নিকট শ্রীরামরাজার বাড়ীর গড়খাই প্রভৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশের নাম ছাপাইনগর। এই শ্রীরামরাজার ঐতিহাসিক বিবরণ জানা যায় নাই। "কালুগাজী চাম্পাবতী" নামক পুঁথিতে বর্ণিত আছে যে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাবীর গাজী ("ঝিকরগাছা ঘাট" দ্রষ্টব্য) ছাপাইনগরের শ্রীরামরাজার বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতার প্রভাবে তাঁহাকে পরাজিত ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অনেকে অনুমান করেন পুঁথিতে বর্ণিত ছাপাইনগর ও শ্রীরামরাজার সহিত এই ছাপাইনগর ও শ্রীরামরাজার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে। সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফরখানের পুত্র বরখান গাজী কর্ত্তৃক ছাপাইনগর বিজয়ের কাহিনীই হয়ত রূপান্তরিত হইয়া গাথা-সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বারবাজারের ধ্বংসাবশেষ ও পুকুরগুলির বিভিন্ন আকৃতি হইতে অনুমিত হয় যে এখানে পর্য্যায়ক্রমে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং, ইতসিং প্রভৃতি বর্ণিত সমতট রাজ্যের রাজধানী এই স্থানে ছিল। য়ুয়ান্ চোয়াংএর বিবরণ অনুসারে ইহা তাম্র-লিপ্তি হইতে ৯০০ লী পূর্ব্বে। কানিংহাম সাহেবের মতে সমতটের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান যশোহরের নিকটস্থ মুড়লী কস্‌বায়।

ঝিনাইদহ—যশোহর হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে। যশোহর হইতে ঝিনাইদহ ২৮ মাইল দূর। প্রধান লাইনের চুয়াডাঙ্গা স্টেশন হইতে ইহা ২৩ মাইল দূর। শহরটি নবগঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত। ইহা যশোহর জেলার অন্যতম মহকুমা। পূর্ব্বে এই মহকুমায় বহু নীলের চাষ হইত। ইহার নানাস্থানে পুরাতন নীলকুঠি দেখিতে পাওয়া যায়। ঝিনাইদহের চারিপার্শ্বে পূর্ব্বে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে বহু লোকে ডাকাতের হাতে অত্যাচারিত হইয়াছে বলিয়া কথিত। এখনও পুষ্করিণীটি চক্ষুকোরা নামে অভিহিত।

ঝিনাইদহের পূর্ব্বদিকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত বিজয়পুরে মুকুটরায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজার রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামন্তের মধ্যে ১৬ হল্‌কা হাতী, ২০ হল্‌কা ঘোড়া ও ২২০০ কোড়াদার ছিল। তিনি বহু জলাশয় খনন করান, উহাদের মধ্যে ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী ঢোল-সমুদ্র নামক বৃহৎ দীঘির পরিমাণ প্রায় ৫২ বিঘার উপর। বিজয়পুরের নিকটবর্ত্তী "বেড়বাড়ী" নামক স্থানে তাঁহার বহু গাভী থাকিত। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "বৃন্দা-বনের নন্দ" আখ্যা দিয়াছিল।

কথিত আছে যে গয়েশ কাজী নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে গো-হত্যা করায় তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন। এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি গয়েশ-উদ্-দীনের পরিচালনায় বহু সৈন্য প্রেরণ করেন। রঘুপতি ঘোষ, চণ্ডী ও কেশব সর্দ্দার নামক তিনজন সেনানায়ক মুকুটরায়ের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত নবাব সৈন্যকে হটাইয়া রাখেন। নবাব সৈন্য ভ্রমে তাঁহারা স্বপক্ষীয় কয়েকজন পাঠানকে নরবলি প্রদান করেন। ইহাতে মুকুটরায়ের পক্ষীয় পাঠানেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। প্রধানতঃ এই কারণে ও কপোত-বিভ্রাটের ফলে (বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ের দেগঙ্গা স্টেশন দ্রষ্টব্য) মুকুটরায় পরাজিত ও ও বন্দী হন বলিয়া কথিত। মুকুটরায়ের কন্যা স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী একটি পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। এই পুষ্করিণীটি পরে "কন্যাদহ" নামে পরিচিত হয়।

নলডাঙ্গা—ঝিনাইদহ হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে এবং যশোহর হইতে ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত নলডাঙ্গা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। ইহারা নলডাঙ্গার রাজা নামে পরিচিত। নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মঠ-বাড়ীতে আটটি পুরাতন মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী গঞ্জনগর নামক স্থানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এই স্থানে একটি পঞ্চমুণ্ডি আসন ও কালীতলাদহ নামক একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ এই পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসিয়া যে কেহ সাধনার চেষ্টা করিতেন, তাঁহাকেই অপদেবতারা নিকটবর্ত্তী কালীতলাদহে ডুবাইয়া মারিত। অবশেষে ভৈরব ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তিশালী সাধক এই আসনে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। রাত্রিকালে এখনও কালীতলাদহ হইতে নাকি শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

নড়াইল—যশোহর হইতে মোটরবাসে অথবা দৌলতপুর কিম্বা খুলনা হইয়া স্টীমারযোগে যশোহর জেলার অন্যতম মহকুমা নড়াইলে যাওয়া যায়। যশোহর হইতে নড়াইল ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত। নড়াইলে রায় উপাধিধারী প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। এই বংশের রামরতন রায় বা রতন বাবুর প্রতাপের কথা বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। জমিদার বাবুদের বাসভবন, সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর ও গোবিন্দজীর মন্দির এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। নড়াইলের সরু চিঁড়া ও খেজুর গুড়ের সুগন্ধযুক্ত পাটালি বিখ্যাত। নড়াইল শহরের অন্তঃপাতী মহিষখোলা গ্রাম সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ৺রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর জন্মস্থান। গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল রাইচরণ ঘোষ। "নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম" এই মন্ত্র প্রচার করিয়া তিনি বৈষ্ণব সমাজে এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। "চরিত সুধা" নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। নবদ্বীপের রাধারমণ বাগে তাঁহার সমাজ বা সমাধি বিদ্যমান।

সিঙ্গিয়া—কলিকাতা হইতে ৮৪ মাইল দূর। সিঙ্গিয়া স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত শেখহাটী বা শাঁখহাটী একটি পুরাতন স্থান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিবার

পর এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী দেওভোগ বা দেবভোগ প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন শাঁখহাটী বা শঙ্খহাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেবভোগের এক অংশকে বিজয়তলা বলে। স্থানীয় প্রবাদ এই স্থানে বল্লাল সেনের পিতা রাজা বিজয় সেনের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বল্লাল সেনের রাজ্য পাঁচটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল যথা, বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ, বরেন্দ্র, মিথিলা, রাঢ় ও বগড়ী এবং ইহাদের মধ্যে বগড়ীর প্রাদেশিক রাজধানী ছিল শেখহাটী অঞ্চলে। শাঁখহাটিতে লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত ভুবনেশ্বরী দেবীর একটি বিগ্রহ বিদ্যমান। এই প্রস্তর নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি অতি সুন্দর। একখানি অখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর কুঁদিয়া মূর্ত্তিটি নিৰ্ম্মিত। ভুবনেশ্বরী দেবীর পৌরাণিক ধ্যান অনুযায়ী পারিজাত কাননে কল্পবৃক্ষতলে মণিময় বেদীর উপর দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা। দেবীর ছয়খানি হস্তে শঙ্খ, কমণ্ডলু, অঙ্কুশ, পদ্ম, পুষ্পবাণ ও বরমুদ্রা বিরাজিত, গলে রত্নহার ও মস্তকে রত্নমুকুট। শাঁখহাটির এই প্রাচীন দেবী মূর্ত্তিটি বাংলার ভাস্কর্য্য শিল্পের অতি অপূর্ব্ব নিদর্শন। মূর্ত্তিটি ৫ ফুট ও প্রস্থে ২′—৫″ ইঞ্চি।

প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি কালিদাস রায় পুষ্করিণী খননকালে মূর্ত্তিটি পাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে এখানকার জমিদারী নানা হাত ঘুরিয়া নড়াইলের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সিঙ্গিয়ার নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে বহুকাল হইতে অনেকগুলি পাঠান পরিবারের বাস আছে। সুবিখ্যাত "মহিলা" কাব্যের কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জগন্নাথপুরের অধিবাসী ছিলেন।

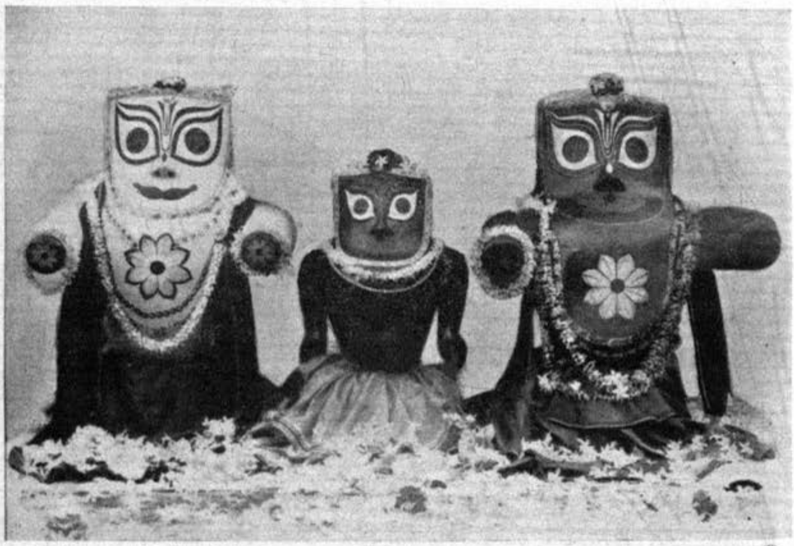
চেঙ্গুটিয়া—কলিকাতা হইতে ৮৮ মাইল দূর। চেঙ্গুটিয়া স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত প্রেমভাগ, তপনভাগ ও দেয়াপাড়া প্রভৃতি স্থানের সহিত অতীতের স্মৃতি বিজড়িত আছে। প্রেমভাগের চলিত নাম পমভাগ; তপনভাগ ও দেয়াপাড়া ইহার বিপরীত দিকে ভৈরব নদের অপর পারে অবস্থিত। প্রেমভাগে স্বনামধন্য বৈষ্ণব গোস্বামী রূপ ও সনাতনের একটি বাসভবন ছিল। ইহাদের জন্মস্থান ছিল বাক্‌লায় (বর্ত্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত) ও কর্ম্মস্থান ছিল রাজধানী গৌড়ে; রাজ সরকারে ইহারা অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গৌড় হইতে জন্মস্থান বাক্‌লায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইহারা প্রায় মধ্যপথবর্ত্তী প্রেমভাগে একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন। রূপ ও সনাতন উচ্চ রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন সন্ন্যাসী হন, তৎপূর্ব্বে তাঁহারা গৌড় হইতে তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থাদি প্রেমভাগের বাটীতে প্রেরণ করেন এবং এই স্থান হইতে উহার যথাযোগ্য বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রেমভাগ সরকার ফতেহাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই জন্য ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে এই স্থান ফতেহাবাদ নামেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেমভাগে রূপ-সনাতন কর্ত্তৃক খনিত কয়েকটি পুরাতন পুকুর, তাঁহাদের বাটীর ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি আজিও দৃষ্ট হয়। রূপ গোস্বামী "কারিকা" নামে একটি পুস্তক বাংলা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলা গদ্য বেশ সুখবোধ্য ও প্রসাদগুণ সমন্বিত ছিল। ধর্ম্মসাধনায় নিমগ্ন হইয়া রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবনের সুন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর

মন্দিরটি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। লাল পাথরের মদন-মোহন মন্দিরটি সনাতন গোস্বামী নির্ম্মাণ করান। এই মন্দিরের উপরের দিকে একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রথমে বাংলা লিপিতে এবং পরে দেবনাগরীতে খোদিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে তপনভাগ ও দেয়াপাড়ার পূর্ব্বনাম যথাক্রমে তপোবনভাগ ও দেবপল্লী ছিল। এই দুই স্থানের সহিতও রূপ-সনাতনের সম্বন্ধ ছিল। কেহ কেহ আবার এই সকল স্থানের সহিত লক্ষ্মণসেনের সংশ্রব ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

নওয়াপাড়া—কলিকাতা হইতে ৯১ মাইল দূর। স্থানটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। এখানে একন বিখ্যাত পীর ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে বুনো নামক গ্রামে এক প্রসিদ্ধ শীতলা আছেন। তথায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

তালতলাহাট—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূর। এই স্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ভৈরব নদের তীরে ভাটপাড়া নামক গ্রামে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে,



জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম বিগ্রহ, গুপ্তপুরী ভাটপাড়া

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচল বা পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে ভাটপাড়া নিবাসী দয়ারাম গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব পুরীতে জগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার আশায় গৃহ হইতে বহির্গত হন। বহুদিন ধরিয়া পদব্রজে বহু পথ অতিক্রম করিবার পর ওড়িষ্যায় পৌছিয়া দয়ারাম সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া জগন্নাথদেব এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং গৃহে ফিরিয়া যাইতে

বলেন। তিনি বলেন যে দয়ারামের আর কষ্ট করিয়া পুরী পর্য্যন্ত যাওয়ার আবশ্যক নাই; তাঁহার ভক্তিতে প্রীত স্বয়ং জগন্নাথদেব দারুরূপে তাঁহার গৃহে গমন করিবেন ও তথায় চিরদিন অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন। তখন প্রীত হইয়া দয়ারাম স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রথমে অনেকেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন ভৈরব নদের উজান স্রোত বাহিত হইয়া একটি নিম গাছ ভাটপাড়ার ঘাটে লাগিল তখন জনগণের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। দয়ারাম এই নিম গাছ হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এই অলৌকিক কাহিনী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে জগন্নাথদেবের সেবার জন্য অর্থ দান করিতে লাগিলেন। দয়ারামের গৃহে পূর্ব্ব হইতেই রাধা ও কৃষ্ণের পূজা হইত। জগন্নাথদেবের আবির্ভাবের পর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহগুলিকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হইল। চাঁচড়ার রাজপরিবার দেবসেবা নির্ব্বাহের জন্য তিন হাজার বিঘা জমি দান করেন। সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভাটপাড়ায় মহাসমারোহে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে অপর একজন ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে অবস্থিত এই বিগ্রহগুলির জন্য ভৈরব তীরবর্ত্তী এই পল্লীটি এতদঞ্চলে তীর্থ-গৌরব লাভ করিয়াছে। পুরী হইতে আগমন করিয়া জগন্নাথদেব এখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া এই গ্রাম সাধারণের নিকট "গুপ্তপুরী ভাটপাড়া" আখ্যা লাভ করিয়াছে। ভাটপাড়ার রথের মেলা যশোহর খুলনায় বিশেষ বিখ্যাত। মেলার সময় তালতলা হাট স্টেশন হইতে ভাটপাড়া পর্য্যন্ত মোটর লঞ্চ ও নৌকা যাতায়াত করে। স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ও দোল পূর্ণিমার সময়েও এখানে বহু লোকের সমাগম হয়।

দৌলতপুর—কলিকাতা হইতে ১০৫ মাইল দূর। স্থানটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত ও খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। এখান হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে পাট, বাঁশ, শিমুল কাঠ, নারিকেল, সুপারি, গুড় ও মাছ চালান যায়। গঞ্জটি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া শহরে পরিণত হইতেছে। খুলনা হইতে যত স্টীমার উত্তরদিকে যায় তাহাদের অধিকাংশই দৌলতপুর হইয়া চলে। এই স্থানে নামিয়া স্টীমারযোগে নড়াইল ও মাগুরা যশোহর জেলার এই দুই মহকুমায় যাওয়া যায়।

দৌলতপুর একটি বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কলেজ পর্য্যন্ত শিক্ষার প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান এখানে বিদ্যমান। দৌলতপুর "হিন্দু একাডেমির" নাম বাংলার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভৈরব নদের তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বহু স্থান জুড়িয়া কলেজ ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলি অবস্থিত। বাংলার আর কোন কলেজের এত অধিক ছাত্রাবাস নাই। কয়েক বৎসর হইল এখানে একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষি-কলেজ ও তৎসংলগ্ন গো-শালা প্রভৃতি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। দৌলতপুর স্টেশনের অতি নিকটে "মহেশ্বর পাশা স্কুল অব্ আর্ট" নামে একটি আর্ট স্কুল ও মহ্‌শীন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় অবস্থিত। ইহা ছাড়া এখানে মক্তব, চতুষ্পাঠী, গুরুট্রেণিং স্কুল, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রভৃতিও আছে। দৌলতপুর কলেজের সম্মুখে "দৌলতপুর কলেজ" নামে একটি রেল স্টেশনও হইয়াছে।

দৌলতপুরের সংলগ্ন **মহেশ্বর পাশা** গ্রামে প্রায় ২০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন একটি সুন্দর জোড়-বাংলা মন্দির আছে। গোপীনাথ গোস্বামী নামক একজন সাধক গোবিন্দ রায় বিগ্রহের জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দৌলতপুরের প্রায় বিপরীত দিকে ভৈরব নদের উত্তর তীরে অবস্থিত **সেনহাটি** একটি প্রাচীন বৈদ্য প্রধান গ্রাম। কেহ কেহ বলেন যে এই গ্রামের সহিত সেনবংশের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণ সেনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। এই গ্রামের বিজয় চণ্ডীতলা নামক স্থানের সহিত সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের স্মৃতি বিজড়িত বলিয়া অনেকের অভিমত। সেনহাটি গ্রামে কয়েকটি পুরাতন মন্দির ও দীঘি আছে। সেনহাটিতে "জ্বরনারায়ণ" নামে এক জ্বরের ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। "সদ্ভাবশতক" প্রণেতা স্বভাব-কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেনহাটীর অধিবাসী ছিলেন।

ভরতভায়না—দৌলতপুর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে বুড়ীভদ্র নদীর তীরে অবস্থিত ভরতভায়না একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ গোলাকৃতি একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ আছে। ইহার পরিধি ৯০০ ফুটেরও অধিক হইবে। স্থানীয় লোকেরা



ভরত ভায়নার স্তূপ [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

ইহাকে "ভরত রাজার দেউল" বলিয়া থাকেন। নিকটবর্ত্তী গৌরীঘোনা গ্রামে একটি ইষ্টক স্তূপ ভরত রাজার বাটী বলিয়া পরিচিত। এই ভরত রাজা কে ছিলেন তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ইহা কোন প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের ধারণা এই স্তূপটি খনন করা হইলে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে। প্রাচীনকালে যশোহর-খুলনা সমতট রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। সমতটে বৌদ্ধ প্রভাবের বিবরণ প্রাচীন পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে তৎকালে বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

খুলনা—কলিকাতা হইতে ১০৯ মাইল দূর। ইহা ভৈরব নদ ও রূপসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং মধ্য-বঙ্গের একটি প্রধান গঞ্জ ও বন্দর। নদীর তীর দিয়া খুলনা শহরের দৃশ্য অতি সুন্দর। খুলনা শহরে আধুনিক নাগরিক জীবনের প্রায় সকল প্রকার সুখ সুবিধাই বর্ত্তমান আছে। এই শহরের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে ছেলেদের জন্য তিনটি এবং মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। খুলনা শহরে প্রতি সপ্তাহের শনি ও বুধবারে প্রকাণ্ড হাট বসে। উহা "সাহেবের হাট" নামে পরিচিত। বহু বৎসর পূর্ব্বে নীলকর শ্যালেট সাহেব এই হাটের সৃষ্টি করেন।

বর্ত্তমান খুলনা শহর হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরে রেণীগঞ্জ নামক স্থানে পুরাতন খুলনা অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল নয়াবাদ। স্থানীয় নীলকর রেণী সাহেবের অত্যাচার নিবারণের জন্য ইংরেজ সরকার এখানে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একটি মহকুমা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়েন। বাংলাদেশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম মহকুমা। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খুলনা স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। এখানে রেণী সাহেবের একটি কুঠি এখনও বর্ত্তমান আছে, উহার প্রাঙ্গনে রেণীর এক পুত্রের সমাধি আছে। স্থানীয় লোকেদের সমবেত চেষ্টার ফলে অবশেষে অত্যাচারী রেণী সাহেবের পতন ঘটে।

"খুলনা" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যের নায়ক ধনপতি সদাগরের পত্নী খুল্লনার নাম হইতেই এই স্থানের নাম খুলনা হইয়াছে। বর্ত্তমান রেণী-গঞ্জের সামান্য উত্তরে তালিবপুর গ্রামে ধনপতি সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত "খুল্লনেশ্বরী" কালী আজিও পূজিত হইতেছেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী লহনার নামানুসারেও ধনপতি ভৈরবের উত্তর তীরে "লহনেশ্বরী" নামে এক কালী প্রতিষ্ঠা করেন। যে স্থানে কালীর মন্দির অবস্থিত তথায় বহু উলুবন থাকার জন্য এই কালী সাধারণের নিকট "উলুবনের কালী" নামে পরিচিত। খুলনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকার প্রবাদও প্রচলিত আছে। এখন যেখানে খুলনা শহর পূর্ব্বে তথায় গভীর জঙ্গল ছিল। প্রকৃত-পক্ষে এই স্থান হইতেই সুন্দরবনের আরম্ভ ছিল। যে সকল লোক সুন্দরবনে কাষ্ঠ, গোলপাতা, হোগলা অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যাইত, তাহারা প্রাচীন খুলনা বা নয়া-বাদের থানার নিকট নৌকা রাখিয়া রাত্রি যাপন করিত। অনুকূল স্রোত বা বায়ুর জন্য কোন মাঝি রাত্রিকালে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিলে বন মধ্য হইতে নাকি বনদেবতা বলিয়া উঠিতেন, "খুলো না, খুলো না"। কেহ কেহ বলেন যে এই কারণেই এই স্থানের নাম "খুলোনা" বা খুলনা হয়।

খুলনা শহরের বিপরীত দিকে ভৈরব নদের উত্তর পারে অবস্থিত **সেনের বাজার** একটি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ, সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন এই বাজারটির প্রতিষ্ঠাতা। শাঁখহাটি ও সেনহাটির সহিত লক্ষ্মণ সেনের সংশ্রবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সেনের বাজারের অদূরে কাজীর জাঙ্গাল, কাজীর দীঘি ও কাজীর দেউড়ি প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি আছে।

আলা-উদ্-দীন হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন এই স্থানে সুবি খাঁ ও সুচি খাঁ নামক দুইজন কাজী ছিলেন। তাঁহাদের পিতার নাম ছিল পঞ্চরঙ্গ খাঁ। পঞ্চরঙ্গ প্রথমে হিন্দু ছিলেন; তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল চতুরঙ্গ ভদ্র। প্রাচীন নয়াবাদ বা বর্ত্তমান রেণীগঞ্জের উত্তরে ভৈরব নদের তীরে **ভদ্রগাতি** নামক গ্রামে তাঁহার গড়বেষ্টিত ভবন ছিল। দুই একটি "জাঙ্গাল" ভিন্ন ভদ্রগাতির অন্যান্য প্রাচীন চিহ্ন ভৈরব নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। চতুরঙ্গ ভদ্র হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি ভদ্রগাতি হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত শ্রীফলতলা নামক গ্রামে কন্যা-জামাতার জন্য এক সুরক্ষিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া দেন। প্রবাদ যে গৌড় নগরে জনৈক জ্যোতিষী তাঁহার হাত দেখিয়া বলেন যে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার বংশধরগণের ভোগে আসিবে না, উহা তাঁহার দৌহিত্র পাইবে। ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তিনি একমাত্র দৌহিত্রকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় পুত্রের নামে একখানি পত্র লিখিয়া জনৈক বাহকের দ্বারা প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে ঐ পত্র তাঁহার পুত্রের হস্তে না পৌঁছিয়া দৌহিত্রের হাতে গিয়াই পড়ে। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চতুরঙ্গের দৌহিত্র মাতুল বংশের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং স্বীয় লোকজনসহ মাতামহের ভবন আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে সবংশে নিধন করেন। যে পুষ্করিণী মধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ সকল নিক্ষেপ করা হয় তাহা লোকে আজিও দেখাইয়া থাকে। চতুরঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া পাগলের মত হইয়া যান। কথিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে তিনি গৌড়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তখন তাঁহার নাম হয় পঞ্চরঙ্গ খাঁ। তিনি পুনরায় বিবাহ করেন এবং তাঁহার মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয়ের জন্য বেলফুলিয়া পরগণার কাজীর পদ যোগাড় করিয়া দেন। এই কাজীবংশের ধারা আজিও অব্যাহত আছে। চতুরঙ্গ কর্ত্তৃক খনিত শ্রীফলতলা গ্রামের প্রাচীন দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে।

খুলনা শহর হইতে যথাক্রমে তিন মাইল ও পাঁচ মাইল দূরে হুসেনপুর ও আলাইপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে এই দুইটি গ্রাম গৌড়েশ্বর আলা-উদ্-দীন হুসেন শাহের স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহাদের মতে হুসেন শাহের বাল্যজীবন এই আলাইপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামের কাজীবাড়ীতে অতিবাহিত হয় এবং এখানেই তাঁহার শ্বশুর বাড়ী ছিল। চাঁদপুর গ্রামটি অধুনা একটি নগণ্য পল্লী হইলেও এক সময়ে ইহা যে একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও অনুমান করিতে পারা যায়। আলাইপুর গ্রামটি ভৈরব ও আঠারবাঁকি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটি বড় বন্দর ছিল। ভৈরব নদ মজিয়া যাওয়ায় ইহা এখন একটি সামান্য বাজারে পরিণত হইয়াছে।

খুলনা হইতে দৈনিক অনেকগুলি স্টীমার সার্ভিস আছে। এখান হইতে স্টীমার যোগে পশ্চিমদিকে এই জেলার অন্যতম মহকুমা সাতক্ষীরা, উত্তরদিকে যশোর জেলার নড়াইল

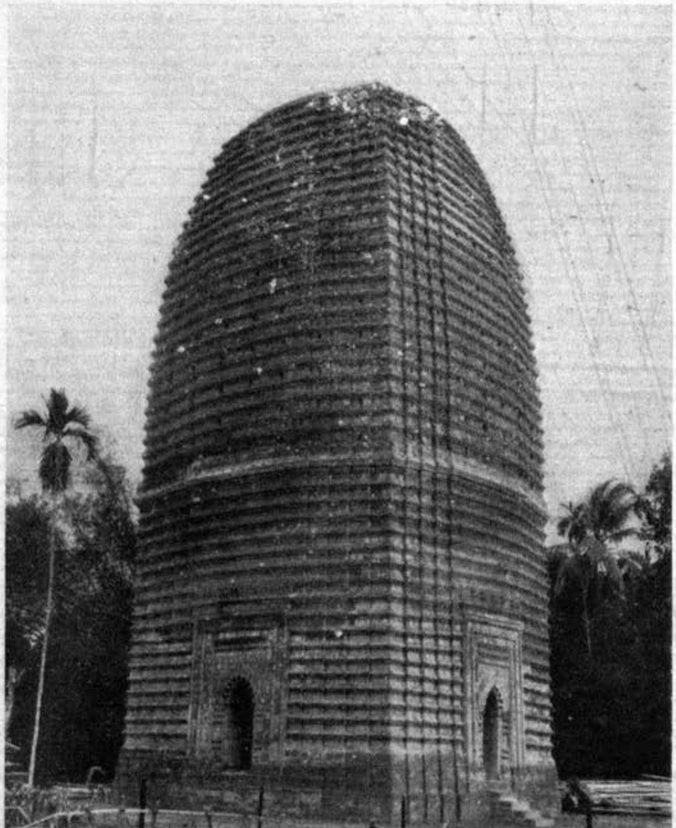
ও মাগুরা মহকুমা, যশোহর জেলার অন্তর্গত রাজা সীতারাম রায়ের প্রাচীন রাজধানী মহম্মদপুর এবং তাহার অনতিদূরে এই রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখার বোয়ালমারি বাজার নামক গঞ্জ, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর মহকুমা এবং পূর্ব্বদিকে বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলার সদর শহর বরিশাল যাওয়া যায়।

রূপসা ঈস্ট্—খুলনা শহরের নিকটে রূপসা নদীর পূর্ব্বে তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে খুলনা-বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের আরম্ভ। খুলনাঘাট ও রূপসা ঈস্টের মধ্যে ফেরী ষ্টীমার যাতায়াত করে। স্টেশনের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ নীলকর রেণী সাহেবের কুঠি অবস্থিত।

বাহিরদিয়া—কলিকাতা হইতে ১১৫ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে মানসার বাজার নামে একটি পুরাতন গঞ্জ আছে। এই বাজারে "বুড়ীমা" নামে এক বিখ্যাত মৃন্ময়ী কালী আছেন। ইহার মুখ পশ্চিমাভিমুখী। কথিত আছে, পূর্ব্বে কালী প্রতিমার মুখ দক্ষিণাভিমুখে ছিল। একদিন নিকটবর্ত্তী ভৈরব নদ দিয়া একদল দাঁড়ি "সারি" গান গাহিয়া যাইতেছিল ; উহা শুনিবার জন্য কালী প্রতিমা নাকি পশ্চিমদিকে মুখ ফিরান এবং সেই দিন হইতে তদবস্থায় রহিয়াছেন। এই কালী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে। এখানে শনি ও মঙ্গলবারে যাত্রীর সমাগম হয়।

যাত্রাপুর—কলিকাতা হইতে ১২৩ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে শীর্ণকায় ভৈরবনদের অপর পারে লাউপালা গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত বালকদাস বাবাজীর সমাধি মন্দির ও তৎপ্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর মন্দির অবস্থিত। প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বালকদাস জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, স্বপ্নে আদেশ পাইয়া তিনি ভৈরব নদের মধ্য হইতে গোপালজীউর বিগ্রহ লাভ করেন এবং ভিক্ষালব্ধ অর্থে একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালজীউর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা রূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাস গোপাল বিগ্রহকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং গোপালের সহিত তাঁহার নাকি প্রত্যক্ষ কথাবার্ত্তা চলিত। জনশ্রুতি যে একবার গোপাল বালকের বেশে বরিশাল জেলার ঝালকাঠি বন্দরে গিয়া জনৈক ময়রার সন্দেশ খাইয়া মূল্যের পরিবর্ত্তে স্বীয় হস্তের স্বুবর্ণ বলয় তাঁহাকে দিয়া আসেন। পরদিন বিগ্রহের হস্ত শূন্য দেখিয়া বালকদাস এ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে গোপাল নাকি তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলেন। বালকদাস ঝালকাঠিতে গিয়া ময়রার নিকট হইতে গোপালের বলয় ছাড়াইয়া আনেন এবং ময়রা সেই দিন হইতে গোপালজীউর একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। গোপালের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে গোপালের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয় এবং তদুপলক্ষে যাত্রাপুরে প্রায় পক্ষকালস্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় আনুমানিক ১৫ হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং ইহাতে সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোক শিল্পের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রথযাত্রা হইতেই গ্রামের নাম যাত্রাপুর হইয়াছে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। যাত্রাপুর সুপারি ও নারিকেলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

যাত্রাপুর হইতে দুই মাইল দূরে প্রাচীন ভৈরব নদের তীরে কোদলা গ্রামে "অযোধ্যার মঠ" নামে একটি পুরাতন মঠ আছে। এই মঠটি বর্ত্তমানে সরকারের "রক্ষিত কীর্ত্তি" বিভাগের অধীন। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। কবে কাহার দ্বারা এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইহার দ্বারের উপর উৎকীর্ণ একটি লিপির ক্ষয় প্রাপ্ত অংশ হইতে অনুমিত হয় যে কাহারও চিতাভস্মের উপর



অযোধ্যার মঠ—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

এই মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক তাঁহার সভাপণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতি-স্তম্ভ রূপে মঠটি নির্ম্মিত হয়। সমগ্র খুলনা জেলার মধ্যে ইহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। যাত্রাপুর হইতে কোদলা গ্রাম পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের ভাল কাঁচা রাস্তা আছে।

ষাটগুম্বজরোড—কলিকাতা হইতে ১২৬ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ইতিহাস বিশ্রুত খান জাহান্ আলির দরগা ও ষাটগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। যাঁহারা ঘোড়ার গাড়ী বা মোটরযোগে ষাটগুম্বজে যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বাগেরহাট হইতে যাওয়াই সুবিধা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উলুগ-খাঁ-জাহান নামক একজন মুসলমানধর্ম্ম প্রচারক সুন্দরবনের বনাঞ্চল পরিষ্কার করিয়া তথায় হাবেলী নামে একটি শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহর খুলনার বহু স্থানে তাঁহার নির্ম্মিত মসজিদ ও দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার একদল বেলদার সৈন্য ছিল; তাহাদের কাজ ছিল পথের দুই পার্শ্বে বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করা। জনসাধারণের নিকট ইনি "খাঞ্জালি" নামে সুপরিচিত। ঠাকুর দীঘি নামক একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের তীরে উচ্চ ভূমির উপর খান জাহান আলির সুন্দর সমাধি সৌধটি অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট ও উচ্চতা ২৫ ফুট, ইহার ছাদে একটি মাত্র গুম্বজ আছে। এই সৌধের ভিতর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর খান্ জাহানের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। কবরের প্রস্তর গাত্রে আরবী ভাষায় আশীর্ব্বাদ খোদিত আছে। ইহার দক্ষিণদিকে একটি ত্রিকোণের মধ্যে লিখিত আছে যে সুমহান খান্ জাহানের কবরটি নন্দন কাননের অংশ। ইহার তারিখ ৮৬৩ হিজরার ২৬শে জিলহিজ্জা বা ২৩শে অক্টোবর ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। সমাধি-সৌধের পার্শ্বে একটি ছোট মসজিদ আছে এবং নিকটেই পীর খান জাহানের প্রধান চেলা মহম্মদ তাহির বা পীর আলির সমাধি অবস্থিত। প্রবাদ, মহম্মদ তাহির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যমশীল হন এবং ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য "পীর আলি" আখ্যা লাভ করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই "পীর আলি" বা পীরালি নামে একটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। মহম্মদ তাহির মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে যে পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিলেন তিনিই হিন্দু পীরালি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কথিত।

বাংলার বৃহৎ দীঘি গুলির মধ্যে ঠাকুর দীঘি অন্যতম। জনশ্রুতি যে এই দীঘি খনন কালে ইহার মধ্য হইতে একটি দেববিগ্রহ আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ইহার নাম "ঠাকুর দীঘি" হয়। ইহার বাঁধাঘাটের ভগ্নাংশ আজিও বিদ্যমান আছে। এই দীঘির মধ্যে কতকগুলি বড় বড় কুমীর বাস করে। সাধারণতঃ ইহারা মানুষকে হিংসা করে না এবং দরগার ফকিরগণের আহবানে কিনারার নিকট আসিয়া তাহাদের হাত হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করে। এই গুলি খান্ জাহান্ আলির সময়কার কালাপাহাড় ও ধলাপাহাড় নামক দুটি কুমীরের সন্তান সন্ততি বলিয়া কথিত; খান্ জাহান্ আলি এই নামে ডাকিলে তাঁহার নিকট আসিয়া তাহারা হাজির হইত, তাহাদের বংশধরগণ আজও এই নামে সাড়া দিয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমার দিন খান্ জাহান্ আলির মৃত্যু তিথি উপলক্ষে ঠাকুর দীঘির পাড়ে ও ষাটগুম্বজ মসজিদে খুব বড় মেলা হয়।

খান জাহানের দরগা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সুবিখ্যাত ষাটগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। ইহার নাম ষাটগুম্বজ হইলেও ইহার ছাদে প্রতি শ্রেণীতে সাতটি করিয়া এগারটি শ্রেণীতে মোট ৭৭টি গুম্বজ আছে। মধ্যকার শ্রেণীর গুম্বজগুলি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, অপর গুলির আকৃতি গোলাকার। এই বিশাল মসজিদের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর প্রায় ৯ ফুট

চওড়া; গুম্বজ গুলি ধরিবার জন্য অভ্যন্তরে ৬০টি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। ইহার চরি কোণে চারিটি মিনার আছে। মস্‌জিদটি ছোট ইট দিয়া তৈরী। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০৫ ফুট ও উচ্চতা ২২ ফুট। ইহার সম্মুখদিকে মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও তাহার দুই পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া ছোট খিলান আছে। কারুকার্য্য হিসাবে ইহা সমাধি সৌধ হইতে নিকৃষ্ট।

এই মসজিদের নিকটে "ঘোড়া দীঘি" নামে অপর একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। ইহার মধ্যেও বহু কুমীর বাস করে। নিকটে বিষপুকুর নামক পুষ্করিণীর জল কেহ ব্যবহার করে না; কথিত আছে খান্ জাহান্ আলির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সোনাবিবি বিষ ভক্ষণ করিয়া এই পুকুরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অপরা স্ত্রী বাঘীবিবি ঘোড়া দীঘির পশ্চিম তীরে সমাহিতা আছেন।



ষাটগুম্বজ মসজিদ, বাগেরহাট

বাগেরহাট হইতে ষাটগুম্বজ পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল স্থান জুড়িয়া খান জাহানের আমলের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

খান জাহানের কীর্ত্তিগুলি বর্ত্তমানে সরকারের রক্ষিত কীর্ত্তি বিভাগের অধীন।

বাগেরহাট—কলিকাতা হইতে ১২৯ মাইল দূর। ইহা খুলনা জেলার একটি মহকুমা। বাগেরহাট শহরটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। এখানে ভৈরব নদ বেশ বহমান আছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, শুপারি, নারিকেল ও মাছ রপ্তানি হয়। বাগেরহাটে "প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ" নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। "বাগেরহাট কলেজ" নামে একটি ছোট রেল স্টেশনও আছে। বাগেরহাট উইভিং মিলের ছিটের কাপড়ের বাজারে বেশ চাহিদা আছে। এখানে একটী ছোট পুরাতন মস্‌জিদ আছে। উহা নসরৎ শাহের আমলে

নির্ম্মিত। বঙ্গেশ্বর নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রা বাগেরহাট হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাগেরহাটের আশে পাশে খান জাহান আলির আমলের কতকগুলি পুরাকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাট হইতে ষাটগুম্বজ মস্‌জিদ পর্য্যন্ত খান জাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি রাস্তা এখনও ব্যবহারযোগ্য আছে।

বাগেরহাট হইতে চার মাইল দূরবর্ত্তী শিববাড়ী গ্রামে এক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শিব আছেন। আসলে এই মূর্ত্তিটি একটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। একখণ্ড শূর্পাকৃতি প্রস্তর কুঁদিয়া এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত। পাদপীঠ বাদ দিয়া ইহা ৩২/১ ফুট



শিববাড়ীর শিব (বুদ্ধমূর্ত্তি)—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

উচ্চ এবং প্রস্থে ১ ফুট ৮২/১ ইঞ্চি। ইহার পাদপীঠে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং মধ্যস্থ বড় মূর্ত্তিটির চতুর্দ্দিকে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে। বড় মূর্ত্তিটি একটি চৈত্যের মধ্যে অবস্থিত। এই চৈত্যের উপর বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে একটি মন্দির খোদিত আছে; তাহার মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। প্রধান মূর্ত্তিটির মুখমণ্ডলে শান্ত সমাহিত ভাব অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবাদ, খান জাহান আলির দরগার পার্শ্ববর্ত্তী ঠাকুর দীঘি হইতে এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খান জাহান উহা মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। তিনি ইহাকে শিবমূর্ত্তি নামে পরিচিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাগেরহাট হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধোতখালি ও কুমারখালি নামক শাখা নদী পরিবেষ্টিত চকশ্রী গ্রাম। স্থানটির অবস্থান বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রতাপাদিত্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানকার কাটিকাটা হাট প্রসিদ্ধ; সুন্দরবন আবাদের বহু লোক এখানে হাট করিতে আসেন।

বাগেরহাট হইতে ৫।৬ মাইল দূরে চিরুলিয়া পরগণায় ভৈরব তীরে প্রাচীন গ্রাম পাণিঘাট অবস্থিত। এখানকার অষ্টাদশ ভুজা দেবী মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি কঠিন কষ্টি পাথরে প্রস্তুত। কথিত আছে, বরিশাল রায়েরকাটির জমিদার গন্ধর্ব্বনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র চিরুলিয়া পরগণা প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন; একবার সান্নিপাত জ্বরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বৈদ্যেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; একদিন সহসা একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মৃতপ্রায় রাজচন্দ্রকে জঙ্গল মধ্যে নদীকূলে লইয়া যাইয়া দীক্ষা দান করেন। পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে একই স্থানে দেখা দেন এবং অন্যান্য মূর্ত্তিসহ অষ্টাদশভুজা আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি প্রদান করেন। রাজচন্দ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের পর এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া পরিচিত। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে নানা স্থান হইতে এখানে লোকে পূজা দিতে আসে।

বাগেরহাট হইতে বাখরগঞ্জ জেলার **হুলারহাট** পর্য্যন্ত প্রতিদিন (রবিবার ভিন্ন) স্টীমার যাতায়াত করে। খুলনা-বরিশাল স্টীমার পথেও হুলারহাট পড়ে। বাগেরহাট-হুলারহাট স্টীমার পথে **মরেলগঞ্জ** একটি বড় স্টেশন; এই স্থান বাগেরহাট হইতে আড়াই ঘণ্টার পথ। ইহা বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত সুন্দরবনের মধ্যে পাঙ্গুচি ও বলেশ্বর বা হরিণঘাটা (উপরে যাহা মধুমতী ও গড়াই নামে অভিহিত) নদীর সঙ্গমের আড়াই মাইল উপরে পাঙ্গুচী নদীর কূলে স্থিত। কাছাড় সুন্দরবন স্টীমার পথেও এই স্টেশন পড়ে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মরেল উপাধিধারী দুইজন ইংরেজ এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন, এই জন্য স্থানটির নাম হয় মরেলগঞ্জ। গভীর নদী এবং স্বাভাবিক অন্য সুবিধার জন্য স্থানটিকে সামুদ্রিক জাহাজের উপযোগী একটি বন্দরে পরিণত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার ইহাকে বন্দর বলিয়া ঘোষণাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই; তবে এখনও সুন্দরবনে একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া আছে।

খুলনা হইতে স্টীমার পথে প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ

চাঁদখালি—খুলনা-সাতক্ষীরা স্টীমার পথে চাঁদখালি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। খুলনা হইতে স্টীমারে করিয়া চাঁদখালি যাইতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহা কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন গঞ্জ। পূর্ব্বে ইহা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। এখন চাষ আবাদ হওয়ার ফলে সুন্দরবন দূরে সরিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে যশোহরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট হেঙ্কেল সাহেব সুন্দরবনে চাষ আবাদ প্রবর্ত্তনের জন্য চাঁদখালিতে একটি বাজার ও একটি সরকারী কাছারি স্থাপন

করেন। বর্ত্তমানে কাছারি বাড়িটী নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; হেঙ্কেল সাহেবের খনিত পুষ্করিণী আজিও বর্ত্তমান আছে। কপোতাক্ষীর অপরতীরবর্ত্তী বড়দলের হাট খুব বড় হইয়া যাওয়ায় চাঁদখালির গঞ্জ এখন অনেকটা ছোট হইয়া গিয়াছে। এখানে একটি সরকারী ডাক্তারখানা আছে। পূর্ব্বে যাহারা সুন্দরবনে চাষ আবাদ বা "মহাল" (কাষ্ঠ মধু ও মোম প্রভৃতি সংগ্রহ) করিতে যাইত চাঁদখালি তাহাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে চাঁদখালিকে সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার বলা যাইতে পারে।

চাঁদখালির ৬ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত মসজিদ কুড়গ্রাম একটি পুরাতন স্থান। বহু বৎসর পূর্ব্বে এখানে আবাদের জন্য জঙ্গল পরিস্কার করিবার সময় একটি প্রাচীন মসজিদ আবিষ্কৃত হয় এবং সেইজন্য গ্রামের নাম হয় মসজিদকুড়। এই মসজিদটির গঠন প্রণালী বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাটগুম্বজ মসজিদের অনুরূপ। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটি করিয়া এই মন্দিরে মোট নয়টি গুম্বজ আছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ছয় ফুট চওড়া। চারিটি প্রস্তর স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ অবস্থিত এবং চারি কোণে চারিটি মিনার বিরাজিত। ইহার পশ্চিম দিকের প্রাচীর গাত্রে তিনটি মিহ্‌রাব আছে।

মসজিদকুড়ের দক্ষিণ দিকেই **আমাদি** গ্রাম। ইহার পর সুন্দরবন আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার পরীমালা দেবীর প্রসিদ্ধি আছে। ইনি চতুর্ভুজা চামুণ্ডা মূর্ত্তি। কথিত আছে টাকীর জমিদার ৺গোবিন্দদেব রায়-চৌধুরী মহাশয় স্বপ্ন পাইয়া নিকটস্থ কয়ড়া নদীর কূলে নারায়ণপুর গ্রামে খনন করিয়া মূর্ত্তিটি প্রাপ্ত হন এবং আমাদিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাতক্ষীরা—খুলনা হইতে পশ্চিম দিকে স্টীমার পথে ৭৭ মাইল দূর। ইলাচর নামক স্থানে নামিয়া সাতক্ষীরায় যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে ইটিণ্ডা ঘাট ও পাটকেলঘাটা হইয়া মোটর বাস যোগেও সাতক্ষীরায় যাওয়া যায়। ইহা খুলনা জেলার একটি মহকুমা। শহরটি বেত্রবতী বা বেতনা নদীর একটি অপ্রশস্ত খালের তীরে অবস্থিত। এখানে একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। এই বংশীয় ৺প্রাণনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব, গোবিন্দদেব, মহাকাল ভৈরব, আনন্দময়ী ও অন্নপূর্ণার মন্দির এই শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু। অন্নপূর্ণার মন্দিরটি কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

সাতক্ষীরা শহর হইতে দুই মাইল দূরে বেতনা নদীর তীরে অবস্থিত **লাবসা** বা লাপসা নামক গ্রামে "মাঈচম্পার দরগা" নামে একটি পবিত্র স্থান আছে। এই দরগার মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। ইহার অভ্যন্তরে মাঈচম্পাবিবির কবর বিদ্যমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মাঈচম্পার সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। অধিকাংশের মতে মাঈচম্পা বোগদাদের খলিফার কুমারী কন্যা। ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি এদেশে আগমন করেন। ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের পর তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন এবং লাবসা গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদী দিয়া যাইবার সময় তাঁহার নৌকা নিমজ্জিত হওয়ায় তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল এই স্থানেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য লোকে তাঁহাকে চম্পামাঈ বা মাঈচম্পা নামে অভিহিত করিত। কেহ কেহ বলেন যে "মাঈ" ও "চম্পা" এই দুইটি হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ। বোগদাদের

খলিফা-কন্যার হিন্দু নাম "চম্পা" থাকা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা বলেন যে চম্পাবতী বা চম্পা জনৈক হিন্দুরাজার কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জনৈক মুসলমান ফকির তাঁহাকে বিবাহ করেন। অল্পকাল পরে ফকিরের মৃত্যুর পর চম্পা সকল সময় ঈশ্বর আরাধনায় কালাতিপাত করিতেন বলিয়া তিনি "মাঈ চম্পা" আখ্যা লাভ করেন। অনুমিত হয়, মাঈ চম্পা ও লাউজানি বা ব্রাহ্মণ নগরের মুকুট-রায়ের কন্যা চম্পাবতী একই ব্যক্তি।

সাতক্ষীরা হইতে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কপোতাক্ষী তীরে কুমিরা গ্রাম এক কালে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং নবদ্বীপের পরেই ইহার স্থান ছিল বলিয়া কথিত।

সাতক্ষীরা হইতে ১২ মাইল উত্তরে কলারোয়া থানার নিকটস্থ **নওপাড়া-মণিঘর** গ্রাম; ইহা গড়দানি নামেও অভিহিত। একটি মাটির গড়ের ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি পুরাতন পুষ্করিণী এখানে দৃষ্ট হয়; এগুলি তিয়র রাজার কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। কিংবদন্তী, কোনও এক সময়ে জনৈক তিয়র জাতীয় ব্যক্তি যখন বিলে নৌকা করিয়া মাছ ধরিতে ছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিলটি পার করিয়া দিতে বলেন। তিয়র সম্মত হইয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া যখন বিলটি পার হইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সন্ন্যাসীর ঝোলার স্পর্শ পাইয়া তাঁহার নৌকার একটি লৌহ পাটা সোণায় পরিণত হইল। তিয়র বুঝিলেন ঝোলার মধ্যে পরশ পাথর আছে এবং লোভে পড়িয়া পাথরটি কাড়িয়া লইয়া সন্ন্যাসীকে গভীর জলে ফেলিয়া দিলেন; জলে ডুবিবার সময়ে সন্ন্যাসী অভিসম্পাত করিলেন যে তিয়র সপরিবারে বিনষ্ট হইবেন। পরশ পাথরের গুণে তিয়রের বহু ধন-দৌলত হইল এবং তিনি রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। তিনি একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ১২৬টি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই বাংলার নবাব তাহার ধনসম্পত্তি প্রাপ্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিয়র ভাবিলেন হয়তো এরূপভাবে ধনপ্রাপ্তির জন্য নবাবের হাতে প্রাণ হারাইতে হইতে পারে এবং পাছে মহিলাদের সম্ভ্রম হানি হয় এই জন্য সঙ্গে করিয়া একজোড়া বার্ত্তাবাহী কপোত লইয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন যে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় জানিলে এবং মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিলে পায়রা দুইটি ছাড়িয়া দিবেন। তিয়র রাজাকে নবাব সসম্মানে ছাড়িয়া দিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পায়রা দুটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যায়। ঘরে পায়রা ফিরিতে দেখিয়া তিয়র রাজার স্ত্রী ও সন্তানগণ একটি নৌকায় করিয়া বড় পুকুরের মধ্যস্থলে পৌঁছিয়া নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিয়র রাজা প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া ছুটাইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনিও বড় পুকুরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; এইরূপে সন্ন্যাসীর অভিশাপ পূর্ণ হইল। এই বড় পুকুরটিকে লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে। গ্রামের যে স্থানে গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে উহাকে দানা-মণিঘর বা 'ধনপোতার' দানা বলা হয়; লোকের বিশ্বাস উহার নীচে তিয়র রাজার ধনদৌলত প্রোথিত আছে।

ঈশ্বরীপুর—সাতক্ষীরা হইতে নৌকা-পথে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে অবস্থিত ঈশ্বরীপুর বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক

স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এই স্থানের পুরাতন নাম যশোহর এবং এখানেই প্রাচীন যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভারতচন্দ্রের অমর কবিতায় যশোর নগর ও যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
বরপুত্র ভবানীর খ্যাত হৈল পৃথিবীর
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাই আঁটে তায়
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
অযুত তুরঙ্গ সাথী ষোড়শ হলকাহাতী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥"

ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৬৩-১৫৭২ খৃষ্টাব্দে) সুলেমান করবানী যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন শিবানন্দগুহ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান কানুনগো ছিলেন। এই শিবানন্দের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ সুলেমানের পুত্র দায়ুদের সমবয়স্ক ও সহপাঠী ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন। রাজ্যলাভ করিবার পর দায়ুদ শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া উভয়কে যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায় উপাধি প্রদান করেন; ইহারা দুজনে খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই ছিলেন। বসন্তরায় সমগ্র বাংলা মুলুকের সম্পূর্ণ রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করিয়া গৌড় দরবারে খ্যাতি লাভ করেন। টোড়রমল্লের "আসল তুমার জমা" নামক বাংলার প্রসিদ্ধ রাজস্ব হিসাব বসন্তরায়ের হিসাবের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া কথিত।

এই সময়ে সুন্দরবন অঞ্চল অনেকটা বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়িয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় দায়ুদের নিকট হইতে উহা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া গভীর অরণ্য মধ্যে যমুনা নদীর তটে যশোহর নামে এক নগরের পত্তন করেন। অতঃপর রাজমহলের যুদ্ধে সম্রাট্ আক্‌বরের ফৌজের হস্তে পরাজিত হইয়া সুলতান দায়ুদখাঁ যখন সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণের পর ওড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন, তখন তিনি তাঁহার বিপুল অর্থরাশি রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায়ের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া যান। দায়ুদের পতনের পর উভয় ভ্রাতা সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যশোহর রাজ্যের সনদ প্রাপ্ত হন। গৌড় হইতে আনীত বিপুল ধনরাশির সাহায্যে সুন্দরবনের নব নির্ম্মিত শহরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রবাদ, গৌড়ের যশ হরণ করিয়া এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার পুরাতন স্থানীয় নাম যশোর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নামকরণ হয় "যশোহর"। এই নামকরণ বসন্তরায়ের বলিয়া কথিত। তাঁহার চেষ্টায় যশোহরে ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই সময়ে কালীঘাটে কালীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া একটি পর্ণকুটীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বসন্তরায়ই মূর্ত্তির জন্য প্রথম পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র। তাঁহার জন্ম তারিখ ও স্থান লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের অনুমান ১৫৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই প্রতাপ বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে যে প্রতাপের কোষ্ঠী গণিয়া জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন যে তিনি পিতৃদ্রোহী হইবেন। এই জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বিশেষ ভাল চোখে দেখিতেন না এবং সর্ব্বদাই দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। যুবক প্রতাপকে তিনি আগ্রায় বাদশাহী দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্য বাদশাহ আকবরের সুনজরে পড়িয়া যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পিতা ও পিতৃব্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যশোহর রাজ্যের সনদ নিজ নামে করিয়া লইয়া আসিলেন। এইরূপে কোষ্ঠীর ফল ফলিল বলিয়া কথিত।

ঈশ্বরীপুর বা যশোহরের ৮।১০ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে এক নূতন নগরী স্থাপন করিয়া তথায় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল। ধূমঘাটের ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে তীরকাটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে নূতন রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার কারণ দক্ষিণের সমুদ্রপথ হইতে মগ ও পর্ত্তুগীজ আক্রমণ প্রতিহত করিবার সুবিধার জন্য বলিয়া অনুমিত হয়। ধূমঘাটের দুর্গ নির্ম্মাণের প্রধান ভার ছিল প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত পাঠান সেনানায়ক কমল খোজার উপর। কিছুদিনের মধ্যে ঈশ্বরীপুর হইতে ধূমঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলই যশোহর নামে পরিচিত হইল।

রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পর প্রতাপ বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে মগ ও পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচার দমনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে এই জলদস্যুদের লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বহু স্ত্রী পুরুষ ধরিয়া লইয়া ক্রীতদাসরূপে নিয়োজিত করিত এবং ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজ বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। স্থল হইতে বন্দীদিগকে ধরিয়া লইয়া হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত চালাইয়া হালি গাঁথিয়া তাহাদিগকে জাহাজের পাটাতনের নীচে বোঝাই দিয়া লইয়া যাইত। খাদ্যের জন্য সকাল বিকাল কাঁচা চাউল ছড়াইয়া দিত। ভাগীরথী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহাদের এইরূপ উপদ্রব চলিত। পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী দস্যুগণ পূর্ব্বে হারমাদ নামে অভিহিত হইত, যথা, কবিকঙ্কন চণ্ডীতে "রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে"। হারমাদ কথাটি পর্ত্তুগীজ শব্দ আর্মাডা (armada) বা নৌবহর হইতে উদ্ভূত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই পর্ত্তুগীজগণকে প্রতঙ্কীচ কহিত। আলোয়ালের পদ্মাবতী কাব্যে প্রতঙ্কীচের উল্লেখ আছে। প্রতাপাদিত্য অচিরেই মগ ও হারমাদ দস্যুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকে তাঁহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে এই সকল মগ ফিরিঙ্গীদিগের বংশধরের বাস আছে। সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহনায়, সমুদ্রতীরে, সন্দ্বীপে, আদিনাথ ও কাকস্‌বাজারে বহু মগপল্লী আছে।

তৎকালে বাংলার দক্ষিণভাগে বা ভাটি অঞ্চলে "দ্বাদশ ভৌমিকের" প্রাধান্য ছিল। ইহাদিগকে লোকে "বার ভুঁইয়া" বলিত। শীঘ্রই প্রতাপ বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়ারূপে

পরিচিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যবল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, বরকন্দাজ, ঢালী, আসোয়ার (অশ্বারোহী), মল্ল প্রভৃতি নানা শ্রেণীভাগ ছিল। বাঙালী, পাঠান, পর্ত্তুগীজ, মগ, কুকী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলে ছিল। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে মহাবীর কালিদাস রায়, বিজয়রাম ভঞ্জ, সূর্য্যকান্ত গুহ, সুখময় ঘোষ, কমল খোজা ও হায়দার মনক্লী প্রধান ছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বড় বড় নদীর মোহনায় তাঁহার অসংখ্য রণতরী সুসজ্জিত থাকিত এবং রাজ্যের নানাস্থানে তিনি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি প্রধান দুর্গ ছিল—ধূমঘাট দুর্গ, গড়কমলপুর, হায়দারগড়, সাগরদ্বীপ, বেদকাশী, জগদ্দল প্রভৃতি। ধূমঘাটের ৪।৫ মাইল উত্তরে জাহাজঘাটায় নৌ-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং পর্ত্তুগীজ জাতীয় ফ্রেডারিক ডুড্‌লি (Frederick Dudley) এই স্থানের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। জাহাজঘাটার ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ইহার কিছু উত্তরে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য কতকগুলি ডক্ (Dock) ছিল; ফ্রেডারিক্ ডুড্‌লির নামে এই স্থানটির নাম হইয়াছে দুধলি।

রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরেই সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি একটি বৃহৎ কল্পতরু দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া কথিত। যে যাহা চাহিয়াছিল তাহাকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল। একটি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজমহিষীকে প্রার্থনা করিয়া বসিলে প্রতাপ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া সত্যপালনে প্রস্তুত হইলেন এবং মহিষী তাঁহার ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং মহিষীকে নিজ কন্যা সম্বোধন করিয়া মহারাজাকে পুনরায় দান করিলেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থামত প্রতাপ মহিষীর ওজনে অর্থ ব্রাহ্মণকে দিয়া পত্নীকে পুনঃ গ্রহণ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য বহু পণ্ডিতকে বৃত্তি দিতেন। তাঁহার সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার গুরুদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন, অবিলম্ব সরস্বতী ও কবি ডিম্ ডিম্ সরস্বতী সমধিক প্রসিদ্ধ। অবিলম্ব সরস্বতীর নাম হয় মুখে মুখে বিনাবিলম্বে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া। তৃতীয় ব্যক্তি প্রকাণ্ড দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু দ্রুত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন না বলিয়া নাম হয় ডিম্ ডিম্। ইতিমধ্যে প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্যের পরলোক ঘটিয়াছিল। রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া মনোমালিন্যের ফলে প্রতাপ খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করেন; কেবল একটি পুত্র রাঘব কচুবনে লুকাইয়া রক্ষা পান; এজন্য পরে তিনি কচুরায় নামে পরিচিত হন। এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রতাপের চরিতকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে রাজা বসন্তরায়ের পুত্রেরাই প্রতাপকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ প্রতাপ তাঁহাদিগকে ও রাজা বসন্তরায়কে হত্যা করিতে বাধ্য হন। আবার কাহারও কাহারও মতে রাজা বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ড প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতেই প্রতাপের পতনের সূচনা হয়। কচুরায় পরে যশোহর-রাজবংশের জনৈক কর্ম্মচারী দুর্গাদাস নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় আগ্রার বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। বাদশাহের আজ্ঞায় প্রতাপের বিরুদ্ধে ফৌজ

প্রেরিত হয়। প্রবাদ, যে প্রতাপ ক্রমান্বয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ২২ জন বাদশাহী সেনাপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। লোকের বিশ্বাস রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরীর অনুগ্রহেই তিনি এই সকল যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন সুরাপানে জ্ঞান হারাইয়া প্রতাপ যখন জনৈক অসহায়া রমণীর স্তনচ্ছেদনের আদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবী যশোরেশ্বরী রাজকন্যার রূপ ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হন। স্বীয় কন্যা জ্ঞানে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য রাজপুরী হইতে দূর হইয়া যাইতে বলেন। "তথাস্তু" বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হন। বিস্মিত প্রতাপাদিত্য তখন দেবী মন্দিরে গিয়া দেখিতে পান যশোরেশ্বরী যথার্থই বিমুখ হইয়াছেন ; পাষাণ প্রতিমার মুখ দক্ষিণ হইতে পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রবাদ, তদবধি দক্ষিণদিকের রাজ্য জঙ্গলময় হইয়া উঠে এবং পশ্চিমদিকের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

প্রতাপের হস্তে উপর্য্যুপরি বাদশাহী ফৌজের পরাজয় ঘটিবার পরে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। প্রথম যুদ্ধে তাঁহারও পরাজয় ঘটে এবং তিনি সুন্দরবন অঞ্চল হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর বর্ষাকালে খাদ্যাদির অভাবে যখন তাঁহার সেনাগণ দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়, তখন যশোহর রাজের কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত দুর্গাদাস প্রতাপাদিত্যের দুর্গের জন্য সংগৃহীত রসদ মানসিংহকে অর্পণ করেন এবং এক গুপ্ত পথ দেখাইয়া মুঘল বাহিনীকে রাজধানীর সন্নিকটে আনয়ন করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং মুঘলের সামন্ত রাজা হইতে স্বীকৃত হন। বসন্তরায়ের পুত্র কচু বা রাঘবরায় পিতৃসম্পত্তি ফিরিয়া পান। আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলামখাঁ বাংলার নবাব হইয়া রাজমহলে আসেন। ইনি পরে ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তথায় তাঁহার দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রতাপাদিত্য সামন্ত রাজা হইলেও সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ছিলেন না। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ইসলামখাঁর ব্যবস্থায় সেনাপতি এনায়েৎখাঁ বিপুল মুঘলবাহিনী লইয়া যশোহর রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং সেনাপতি কমল খোজা নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটিল, যশোরেশ্বরী দেবী চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আরও কিছুদিন যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা নাই দেখিয়া প্রতাপাদিত্য এনায়েৎ খাঁর শিবিরে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন ; আশা করিয়াছিলেন এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় সন্ধি স্থাপিত হইবে। এনায়েৎখাঁ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় প্রেরণ করেন। ইসলামখাঁ কিন্তু তাঁহাকে শৃঙ্খলিত ও বন্দী করেন। তাঁহার বন্দী হওয়ার খবর শুনিয়া ধূমঘাট হতাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে গ্রামবাসী নরনারীর উপর মুঘল সৈন্যগণের অত্যাচারের জন্য রাজকুমার উদয়াদিত্য শত্রুপক্ষকে পুনরায় আক্রমণ করেন এবং ঈশ্বরীপুরের নিকটস্থ নকীপুরের উত্তরে বিস্তৃত কুশলীর মাঠে শেষযুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করেন। এই সংবাদে রাজমহিষী শরৎকুমারী অন্যান্য স্ত্রীপরিবার ও শিশু সন্তান সহ গুপ্ত পথে নৌকা বাহিয়া দুর্গের বাহিরে যাইয়া নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া জলে ডুবিয়া জীবনাহুতি দেন। ধূমঘাট দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোণে সেই স্থান এখনও "শরৎখানার দহ" নামে পরিচিত। এদিকে প্রতাপাদিত্য ঢাকায় কিছুদিন

বন্দী অবস্থায় থাকিয়া লৌহ পিঞ্জরে নৌকাযোগে আগ্রায় প্রেরিত হন। পথিমধ্যে বারাণসীতে ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, যে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট তিনি একবার বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন এবং যাহার উপর কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, গঙ্গাস্নান করিবার অনুমতি পাইলে, সেই ঘাটে স্নানের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন বারাণসীতে অঙ্গুরীয়কে লুক্কায়িত বিষপানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

প্রতাপের পতনের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর কচুরায়কে "যশোরজিৎ" উপাধি দিয়া যশোর রাজ্যের সনদ প্রদান করেন। অসময়ে উপকারকারী দুর্গাদাস কচুরায়ের সুপারিশে বাদশাহের নিকট হইতে কয়েকটি পরগণা ও ভবানন্দ মজুমদার উপাধি লাভ করেন। ইনিই নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন যশোহর রাজ্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর এখন ধ্বংসস্তূপ ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গের মৃৎপ্রাকার, হামামখানা, বারদুয়ারী প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, প্রতাপাদিত্যের মুসলমান কর্ম্মচারিবৃন্দের উপাসনার স্থান টেঙ্গা মসজিদ নামক একটি পুরাতন বৃহৎ মসজিদ এবং যশোরেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ অতীত দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে। অনেকের মতে কষ্টি পাথরের এই কালী মূর্ত্তিতে এরূপ ভীষণভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহা সম্বলপুরের সম্বলেশ্বরী মন্দিরের শনিমূর্ত্তিতে ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাহারও মতে যশোরেশ্বরীর আদি মূর্ত্তি মহারাজ মানসিংহ অম্বরে লইয়া যান এবং পরে কচুরায় এখানে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে ইহাই প্রাচীন মূর্ত্তি এবং মহারাজ মানসিংহ শ্রীপুর হইতে চাঁদরায় কেদার রায়ের শীলাময়ী দেবীকে অম্বরে লইয়া যান। যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যে ধূমঘাটে যখন প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানী ও গড় হইতে ছিল, তখন তাঁহার প্রধান সেনানায়ক কমল খোজা নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধানে থাকা কালীন গভীর অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণের অরণ্য মধ্যে এক স্থানে এক অগ্নি শিখা জ্বলিতে দেখিতেন। প্রতাপাদিত্য এই খবর পাইলে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ইহার উৎপত্তির কারণ সন্ধান করিবার হুকুম করেন। অগ্নি শিখার দিক্ লক্ষ্য করিয়া গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করিলে পুরাতন একটি ধ্বংস-স্তূপ বাহির হয় এবং ইহার নীচ হইতে যশোরেশ্বরীর প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া স্থির করিলেন, ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম যশোরের পীঠ দেবতা; এই স্থানে দেবীর পাণিপদ্ম পতিত হইয়াছিল। সাড়ম্বরে নূতন মন্দিরে দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, প্রতাপের সাহায্যার্থ ভবানী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। কবি ভারতচন্দ্র তাই প্রতাপের বিষয়ে লিখিয়াছেন "বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর।" প্রবাদ দেবীর মূর্ত্তি জ্বালাময়ী বলিয়া মন্দিরে ছাদ থাকিত না, জ্বালা বাহির হইবার জন্য ফাটিয়া যাইত; সেই জন্য মন্দিরের ছাদে চিমনীর মত ফাঁক রাখা হইয়াছে। কবিরাম রচিত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক পুরাতন পুস্তকে লিখিত আছে যে পুরাকালে অনরি নামক এক ব্রাহ্মণ দেবীর জন্য একশত দ্বার-যুক্ত একটি প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার পর ধেনুকর্ণ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা জীর্ণ মন্দিরের বদলে নূতন আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যশোরেশ্বরী মন্দির মধ্যে একটি অপরূপ সুন্দর পাথরের গঙ্গা মূর্ত্তি অন্নপূর্ণা রূপে পূজিত হইতেছে। যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম চণ্ড ভৈরব।

প্রতাপাদিত্য চণ্ড ভৈরবের জন্য যে ত্রিকোণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। চণ্ড ভৈরব এখন যশোরেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত আছে, চণ্ড ভৈরবের জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। টেঙ্গা মস্‌জিদের নিকটেই জঙ্গলাকীর্ণ একটি পরিত্যক্ত মন্দির দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মহারাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার পর এই মন্দিরে শিব স্থাপন করিয়াছিলেন।



চণ্ড ভৈরবের মন্দির, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

টেঙ্গা মসজিদ হইতে উত্তর দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলে ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ইছামতী নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে একটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে ৪০টি পূর্ব্ব পশ্চিমে শায়িত কবর আছে। মুসলমানগণের কবর উত্তর দক্ষিণে শায়িত হয়, সেজন্য এগুলি খৃষ্টানদিগের কবর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই স্থানটি বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম গীর্জার ধ্বংসাবশেষ। প্রতাপাদিত্যের অনুমতি পাইয়া জেস্যুইট সম্প্রদায় ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করিয়া যীশুর গীর্জা নাম করণ করেন। এই বৎসরই ব্যাণ্ডেলের ও চট্টগ্রামের গীর্জা নির্ম্মিত হয়। স্পেনদেশীয় জেস্যুইট ভ্রমণকারী ডুজারিকের (Pierre Du Jarric) বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঈশ্বরীপুরের গীর্জাই বাংলার প্রথম, চট্টগ্রামেরটি দ্বিতীয় এবং ব্যাণ্ডেলেরটি তৃতীয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে গীর্জা প্রতিষ্ঠার উৎসবে প্রতাপাদিত্য যোগ দিয়াছিলেন। এ গীর্জা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই; সন্দীপ লইয়া আরাকানী ও পর্ত্তুগীজদিগের বিরোধের জন্য যে গোলমাল উপস্থিত হয় তাহার ফলে ঈশ্বরীপুরের পাদরীগণ পলাইতে বাধ্য হন এবং গীর্জাটি খৃষ্টানদিগের শত্রুগণ কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ হয়।

ঈশ্বরীপুর হইতে ৩ মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে প্রতাপাদিত্য ৪টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; ইহাদের ৩টি একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং চতুর্থটির নীচের তলা কিছু দাঁড়াইয়া আছে; এই মন্দিরের উপর তলায় প্রতাপাদিত্য পুরী হইতে অতি সুন্দর গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য নামক একজন ওড়িয়া ব্রাহ্মণকে এই বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বিগ্রহটি এখন ঈশ্বরীপুর হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে কাটুনিয়া গ্রামে আছে। এই গ্রামে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বংশীয় কয়েক ঘরের বাস আছে। এখানকার দোল উৎসব সমগ্র খুলনা জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরীপুর হইতে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধামাইল বা ডামরেলী পরগণার অন্তর্গত মুস্তাফাপুর গ্রামে একটি বিরাট নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে; ইহার নয়টি চূড়াই পড়িয়া গিয়াছে, ইহা ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে কোনও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা সমাজ মন্দির রূপে সমাজপতিগণের মিলন ও আলোচনার জন্য নির্ম্মিত হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য সমাজ ব্যবস্থার জন্য নয় জনকে নিযুক্ত করিয়া উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহাদের নবরত্ন নাম দেন এবং তাঁহাদের মিলনকেন্দ্র বলিয়া মন্দিরটির নাম হয় নবরত্ন মন্দির।

গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ ইছাপুরে নবরত্ন মন্দির ব্যতীত যশোহর খুলনায় এত বড় মন্দির আর কোথাও নাই। সৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্যে মন্দিরটি অপূর্ব্ব এবং দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ কান্তজীর মন্দিরের কথা মনে করাইয়া দেয়। গর্ভ মন্দিরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-গাত্রে দশ অবতার, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি নানারূপ চিত্র অঙ্কিত।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ জেস্যুইট পাদরী ফ্রানসিস্ ফারনানডেজ, ডোমিনিক ডিজোসা, মেলকিওর ফনসেকা ও এনড্রু বাউয়েস প্রথম বঙ্গে আসেন। ফরনানডেজ ও ফনসেকার চিঠিপত্রে যে চ্যাণ্ডিকানের রাজার কথা আছে, তিনি প্রতাপাদিত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহাদের চিঠিপত্র প্রভৃতি হইতে ডুজারিক যে ইতিহাস প্রণয়ন করেন তাহাতে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে জেস্যুইটগণের গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠার কথা আছে; ইহা আগে বলা হইয়াছে। চ্যাণ্ডিকানের অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে ধূমঘাট এবং নিকটবর্ত্তী স্থানই এই চ্যাণ্ডিকান। প্রতাপাদিত্যের পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্য গৌড়েশ্বর দাউদের নিকট হইতে সুন্দরবনে যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ইতিহাস বিশ্রুত যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম চাঁদ খাঁ চক। এই চাঁদ খাঁ শব্দের বৈদেশিক বিকৃতি চ্যাণ্ডিকান বলিয়া অনুমিত হয়। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রায় প্রারম্ভেই জেস্যুইট পাদরীগণ তাঁহার নিকট আসেন; সুতরাং তখনও পুরাতন নাম চাঁদ খাঁ টিকিয়া থাকিবারই কথা; নূতন নাম যশোহর একেবারে ইহাকে চাপা দিতে পারে নাই।

প্রতাপাদিত্যের সময় রাজধানী ঈশ্বরীপুরকে কাশী বলা হইত; রাজধানীর শহরতলী প্রভৃতি পূর্ব্বদিকে কপোতাক্ষী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপরে বর্ণিত গোপালপুরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, উহাকে মণিকর্ণিকা বলা হইত। কাশীর অপর পারে স্থিত

ব্যাসকাশী বা বেদকাশীর অনুকরণে কপোতাক্ষীর অপর পারকে বেদকাশী বলা হইত। এখানে যে সকল মন্দির ছিল তাহার অবশেষ একমাত্র ৬।৭টি অতি চমৎকার প্রস্তর স্তম্ভ বর্ত্তমান। এখানে "কালী খালাস খাঁ" নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ১,০০০ ফুটের উপর, প্রস্থে ৬০০ ফুট। বেদকাশী ঈশ্বরীপুর হইতে পূর্ব্বদিকে ১২।১৪ মাইল হইবে এবং সুন্দরবনের ২১১ নং লাটে অবস্থিত। এই স্থানে প্রতাপাদিত্যের একটি দুর্গ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের নিকট ইহা "বড়বাড়ী" নামে পরিচিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ২২৫০ ফুট ও প্রস্থে ১২০০ ফুট।

কালিয়া—খুলনা-বোয়ালমারি কিংবা খুলনা-মাদারীপুর স্টীমার পথে খুলনা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে নড়াইল মহকুমার প্রসিদ্ধ বৈদ্য-প্রধান গ্রাম কালিয়া। কথিত আছে মগ ও বর্গীর অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি দুর্গম জলাভূমির মধ্যে গ্রামটি স্থাপিত হয়।

মহম্মদপুর—খুলনা-বোয়ালমারি স্টীমার পথে খুলনা হইতে নদী পথে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তটে যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমায় অবস্থিত মহম্মদপুর যশোহর জেলার একটি গৌরবের স্থান। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়াঘাট শাখা লাইনের বোয়ালমারি বাজার নামক স্টেশনে নামিয়াও এই স্থানে যাওয়া যায়। বোয়ালমারি বাজার হইতে এই স্থান ৬।৭ মাইল পশ্চিমে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "সীতারাম" নামক উপন্যাসের সহিত শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই পরিচিত। এই মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। সীতারামের আদি নিবাস ছিল বীরভূম জেলায়। জাতিতে তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ প্রথমে রাজ-মহলে নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন, পরে ভূষণা পরগণায় তহশীলদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার পত্নীর নাম দয়াময়ী। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতি গ্রামে দয়াময়ীর পিত্রালয়ে অনুমান ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সীতারামের জন্ম হয়। উদয়নারায়ণ ক্রমে একটি ক্ষুদ্র তালুক ক্রয় করেন এবং মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহর নগরে বাস করিতে থাকেন। হরিহর নগরে এখনও সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মী নারায়ণের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। সীতারামের মাতা দয়াময়ী তেজস্বিনী নারী ছিলেন। কথিত আছে অল্প বয়সে একটি খড়্গের সাহায্যে এক দল ডাকাতকে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদপুরে আজও "দয়াময়ী তলা" নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয়; এই স্থানে সীতারামের সময়ে বারোয়ারী উৎসব হইত। সীতারামের অভ্যুদয় সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলার তদানীন্তন ভৌমিক রাজগণ যথা সময়ে রাজকর না দেওয়ায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে তাঁহাদের নিকট হইতে বাকী রাজকর আদায়ের জন্য সৈন্য সামন্তসহ প্রেরণ করেন। সীতারাম আসিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে বাদশাহের সহিত বিবাদের ফলে তাঁহার পতন ঘটে। মতান্তরে সীতারাম ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মধুমতীর পূর্ব্বপারস্থিত হরিহরনগর নামক একটি ক্ষুদ্র তালুকের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগর নামক গ্রামেও তাঁহার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। প্রবাদ, একদিন এই স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইবার সময় সীতারামের অশ্বের

পদ মৃত্তিকার মধ্যে আটকাইয়া যায়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অশ্ব পদ তুলিতে অসমর্থ হইলে সীতারাম লোকজন ডাকাইয়া এই স্থান খনন করাইয়া দেখিতে পান যে মৃত্তিকা নিম্নস্থ একটি মন্দির-চূড়ার চক্রে তাঁহার অশ্বের পদ আটকাইয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ক্রমশঃ একটি দেবমন্দির ও তন্মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। ইহাকে বিশেষ শুভ লক্ষণ মনে করিয়া সীতারাম এই স্থানেই স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন এবং আরও বহু লোকজনকে আনাইয়া এই স্থানে বসবাস করাইলেন। এইরূপে রাজধানী মহম্মদপুরের সৃষ্টি হইল। প্রবাদ, মহম্মদ শাহ নামক স্থানীয় এক ফকিরের নাম হইতে মহম্মদপুর নাম হইয়াছে। অচিরেই সীতারামের প্রভাবে সমগ্র ভূষণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল এবং বহু দস্যুসর্দ্দার তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দলবলসহ তাঁহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিল। সীতারাম স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তোরাপের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর হস্তে আবু তোরাপ নিহত হইলেন। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রামরূপ (মতান্তরে মৃন্ময়) ঘোষ। ইনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বিরাট কলেবর ও বিপুল শক্তির জন্য ইনি "মেনাহাতী" আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। মেনাহাতীর অর্থ ছোটখাট স্ত্রী হস্তী, তাঁহাকে একটি ছোটখাট হাতী বলিয়াই মনে হইত। আবু তোরাপের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ মেনাহাতী ও সীতারামকে দমন করিবার জন্য বক্স আলিখাঁ ও দিঘাপতিয়ার দয়ারাম রায়ের নেতৃত্বে বহু সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন। জনশ্রুতি যে মহাবীর মেনাহাতী অক্ষয় কবচের অধিকারী ছিলেন; কোনরূপ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ হইত না। একদিন দোল মঞ্চের নিকট দিয়া যাইবার সময় সীতারামের জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর পরামর্শ মত শত্রুসৈন্য তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। সাত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তে নিদারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিবার পর আর সহ্য করিতে না পারিয়া মহাবীর মেনাহাতী স্বীয় অক্ষয় কবচ পরিত্যাগ করেন এবং মৃত্যুকে বরণ করিয়া লন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, যে তাঁহার মৃতদেহ হইতে মস্তকটি কাটিয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে পাঠান হয়। মানুষের মাথা যে এত বড় হইতে পারে তাহা দেখিয়া নবাব মুর্শিদকুলী বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এরূপ মহাবীরকে হত্যা করা কোন মতেই উচিত হয় নাই, নবাব মাথাটি সসম্ভ্রমে মহম্মদপুরে ফিরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সেনাপতির মস্তকহীন দেহ যথারীতি সৎকার করিয়া অস্থি সমাহিত করা হয়; মস্তকটিও তথায় সমাহিত করিয়া সীতারাম একটি উচ্চ সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহম্মদপুরের কাষ্ঠঘর পাড়া হইতে ভূষণার দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে উহারই উপর মেনাহাতীর সমাধিস্তম্ভ ছিল; এখন ইহার চিহ্নও নাই। মেনাহাতীর মৃত্যুর পর সীতারামের পতন ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। কথিত আছে, দয়ারাম রায় বিজয়-চিহ্ন হিসাবে সীতারামের সুন্দর বিগ্রহ দিঘাপতিয়ায় লইয়া যান। দিঘাপতিয়া রাজবাটীতে এই মূর্ত্তি এখনও পূজিত হয়; ইহার পাদদেশে ক্ষোদিত আছে "দয়ারাম বাহাদুর"। দয়ারাম রায়ই সঙ্গে করিয়া সীতারামকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যান। পথিমধ্যে দিঘাপতিয়ায় যাইবার সময়ে তাঁহাকে নাটোর রাজবাটীর কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়া যান; সেই কক্ষ এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদে কয়েক-মাস বন্দী থাকিবার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, কেহ কেহ বলেন তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল।

মহম্মদপুরে সীতারামের বহু কীর্ত্তি আজিও বিদ্যমান আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রামসাগর, সুখসাগর ও কৃষ্ণসাগর নামক দীঘি, দোলমঞ্চ ও রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ, সিংহদরওয়জা, মালখানা, তোষাখানা, দশভুজা মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির, কৃষ্ণজীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহম্মদপুরের দুর্গটি প্রায় সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। অতীতে এই দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ খাত দিয়া মধুমতীর স্রোত প্রবাহিত হইত। সীতারামের দুইটি প্রধান বড় কামানের নামকরণ হইয়াছিল কালে খাঁ ও ঝুম ঝুম খাঁ। রামসাগর দীঘিটি দৈর্ঘ্যে প্রায়



সীতারামের দোলমঞ্চ, মহম্মদপুর [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

১৫০০ ফুট ও প্রস্থে ৬০০ ফুট। ইহার জল এখনও বেশ নির্ম্মল ও ব্যবহারোপযোগী আছে। সুখসাগরের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। কৃষ্ণসাগর দীঘিটি মহম্মদপুর দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কানাই নগর গ্রামে অবস্থিত। এই দীঘিটির আয়তন ১০০০ ফুট × ৩০০ ফুট। এই গ্রামে সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত হরে-কৃষ্ণ বিগ্রহের একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মন্দিরটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট, ইহাই সীতারামের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ মন্দির। মন্দির গাত্রে কৃষ্ণ বলরাম ও নানা দেব-দেবীর ছবি সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে চিত্রিত আছে। পূর্ব্ব দিকের মন্দির গাত্রের কারুকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। গর্ভগৃহে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; এই জন্য স্থানটির নাম হইয়াছিল কানাই নগর বা যদুপতি নগর। এখানে অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্ত্তন হইত। এ অঞ্চলে এখনও

কোনও কিছু না থামিয়া এক ভাবে হইতে থাকিলে "কানাই বাড়ীর কীর্ত্তনের" সহিত তাহার তুলনা করা হয়। সীতারামের পতনের পর ভূষণারাজ্য নাটোর রাজবংশের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। নাটোর রাজ কর্ত্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রজী ও শিবের মন্দির মহম্মদপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

মহম্মদপুর এখন একটি বিরল-বসতি পল্লীগ্রাম মাত্র। ইহার সমৃদ্ধির সময়ে মধুমতী নদী এই স্থানের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমানে নদী প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ মহামারীর ফলে মহম্মদপুর একেবারে বিধস্ত হইয়া যায় এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ইহা একটি নগণ্য গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়। মহম্মদপুরের নিকটস্থ সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে সীতারামের বংশের তাঁহার একমাত্র প্রপৌত্র রাধাকান্তের দৌহিত্র বংশের বাস আছে।

বাগের হাটের খানজাহান আলির মত সীতারামেরও একদল বেলদার সৈন্য ছিল। কথিত আছে সংখ্যায় ইহারা ২,২০০ ছিল এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে জলাশয় খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করাই তাহাদের কাজ ছিল। কথিত আছে, সীতারাম প্রতিদিন নবখনিত জলাশয়ের জলে স্নান করিতেন এবং এই জন্য প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজধানীতে জল আনা হইত। এইরূপে তিনি বহু পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সীতারামের সৈন্যদলে বহু মুসলমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মুসলমান সেনাপতিদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিতেন এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন। গ্রাম্য কবিদের গানে ও গাথায় ইহার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত "সীতারাম রায়" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইল;—

"শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন।
দেশ গায়েতে যা হইল শুন দিয়া মন॥
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই।
কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়।
মুসলমানের রস পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন।
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক্‌গে তেমন॥
মিলে মিশে থাকা সুখ, তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল॥
চুলে ধরে নারী ল'য়ে চড়তে নারে নায়।
সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়া যায়॥"

মহম্মদপুর হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে এবং কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখা লাইনের ভাটিয়াপাড়া স্টেশনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে নবগঙ্গা নদীর তীরে **রায়গ্রামে** মেনাহাতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর নারায়ণ বিগ্রহের জন্য একটি অতি সুন্দর জোড় বাংলা

মন্দির এবং একটি সুন্দর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিব মন্দিরে যে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে মেনাহাতীর মৃত্যুর ১০ বৎসর পরে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। মন্দির দুটি এখনও বিদ্যমান। রায়গ্রামে রামশঙ্করের বংশীয়গণের বাস আছে।

মহম্মদপুর হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নবগঙ্গার পশ্চিমকূলে **সত্রাজিৎপুর** একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। খুলনা হইতে মাগুরা পর্য্যন্ত যে দৈনিক স্টীমার সার্ভিস্ আছে, তাহার উপর সত্রাজিৎপুর একটি স্টীমার স্টেশন। শত্রুজিৎ বা সত্রাজিৎ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায়ের পুত্র। ইনি মুঘলদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেও সুবিধা পাইলেই নিজ ক্ষমতা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। নবাব ইস্‌লাম খাঁর সাহায্যে ইনি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ইনিই ভূষণা হইতে উঠিয়া আসিয়া যশোহর জেলায় নবগঙ্গাতীরে সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ সিংহবংশের ইনি আদি পুরুষ। সত্রাজিৎ মুঘল নবাবদিগকে নানারূপে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। কোচবিহার ও কোচহাজোর রাজাদিগের সহিত মুঘলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে সম্রাট সাজাহানের সময় ধৃত হইয়া ঢাকায় আন্দাজ ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে সত্রাজিৎপুরের রাজ-গৌরব ও স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

মাদারীপুর—খুলনা হইতে প্রতিদিন প্রসিদ্ধ কুমার-মধুখালী-বিল পথে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ হইয়া মাদারীপুর পর্য্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা প্রায় ১৭ ঘণ্টার পথ। মাদারীপুর ফরিদপুর জেলার একটি সদর মহকুমা। বলিতে গেলে এই জেলায় শুধু ফরিদপুর ও মাদারীপুরই শহর পদবাচ্য। একদিকে আড়িয়ল খাঁ ও অন্য দিকে কুমার নদ থাকায় শহরটির দৃশ্য অতীব মনোরম। কথিত আছে, শাহ মাদার নামে জনৈক ফকীর এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে মাদারীপুর। শাহ মাদারের দরগাহ্ ও সমাধি শহরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ইহাকে শ্রদ্ধা করেন। স্থানীয় বণিক্‌গণ সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সময়ে ভক্তিভরে তাঁহার নাম লইয়া থাকেন।

অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের জন্য মাদারীপুর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। পাটের কারবারের জন্য দেশী বিদেশী বহু ব্যবসায়ী এখানে এবং পার্শ্বস্থ চরমুগরিয়াতে অবস্থান করেন এবং চারিদিকে পাটের গুদাম দৃষ্ট হয়।

আড়িয়লখাঁর ভাঙ্গনে মাদারীপুর বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এক শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে, ব্রহ্মপুত্রের গঙ্গায় বা পদ্মায় মিলিত হইবার আগে আড়িয়লখাঁর খাত দিয়াই পদ্মা দক্ষিণে সমুদ্রে গিয়া পড়িত। এখন পদ্মা এ খাত ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আগমন করেন। তাঁহার রঙ্গমতী কাব্য এই স্থানেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

মাদারীপুরের ঠিক দক্ষিণেই ঘাটমাঝি গ্রাম। বহুকাল পূর্ব্বে মেঘা মিঞা নামে এখানে এক জমিদার ছিলেন; তাঁহার কর্ম্মচারী রতিরাম তাঁহারই জমিদারীতে একটি তালুক ক্রয় করিলে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। জমিদার রতিরামের তালুক লুণ্ঠন

করিতে আসিলে গুরুতর দাঙ্গা বাধিয়া যায়; মেঘা মিঞা তাহাতে নিহত হন এবং রতিরাম মেঘা মিঞার জমিদারীর বহু স্থানে লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনার কথা স্থানীয় লোক এখনও ভুলিয়া যান নাই; তাঁহারা ইহা স্মরণ করিয়া বলিয়া থাকেন—

মেঘা মিঞা চেগা হইল বিধি হইল বাম।
ঘাটমাঝি লুটিয়া নিল বুড়া রতিরাম॥

বরিশাল হইতে আড়িয়লখাঁর পথে মাদারীপুর হইয়া পালং নদী ও নরিয়া খাল দিয়া পদ্মার কূলে অবস্থিত ফরিদপুর জেলার তারপাশা পর্য্যন্ত দৈনিক স্টীমার যাতায়াত করে। মাদারীপুর হইতে তারপাশার পথে ফরিদপুর জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান পড়ে। মাদারীপুর হইতে নয় ঘণ্টার রাস্তা **পালং** একটি ছোটখাট শহর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে থানা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। পালংএর দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **কুরাশী** গ্রামে অনেকগুলি পুরাতন পুকুর, মঠ ও শিব মন্দির দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী যে এই গুলির প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায় এক কোটী শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানটিকে কাশীর সমান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কোটি পূর্ণ হইবার সময় একটি শিব অন্তহিত হইয়া যান। কোটী শিব পূর্ণ হইল না বলিয়া ইহা কাশীর সমকক্ষ হইল না, সে জন্য নাকি ইহা কুরাশী নামে অভিহিত। পালংএর ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে **ছয়গাঁ** একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম এবং সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য পূর্ব্ব কাল হইতে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য চূড়ামণির বংশীয় কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম এবং হরিচরণ বিদ্যালঙ্কার, বৈয়াকরণ রামহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই গ্রামের লোক। এই স্থানে বহু নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয় বলিয়া লোকে ইহাকে নারিকেলী ছয়গাঁও বলিয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ দিকের পার্শ্বস্থ গ্রাম **দেভোগে** "বারভূঁইয়া"দের অন্যতম চাঁদ ও কেদার রায়ের জ্ঞাতি বংশীয়দের বাস আছে। দেভোগ হইতে বুড়িরহাট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময়ে মাটির নীচে হইতে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ পাওয়া গিয়াছিল; উহা এখন ঢাকার চিত্রশালায় আছে। পালং হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে মাঐসার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার সিদ্ধপীঠ দিগম্বরী তলার প্রসিদ্ধি আছে। গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নামে একজন সাধক এই পীঠে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান রামভদ্রপুর **মাঐসার** হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। পালং হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে **ধানুকা** গ্রাম সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ; বহু পণ্ডিত এই গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৺চন্দ্রমণি ন্যায়পঞ্চানন সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহার সময়ে ন্যায় শাস্ত্রে বাংলাদেশে তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন। মহারাজ রঞ্জিৎ সিং ইহাকে কিছু দিনের জন্য সভাপতি করিয়া পঞ্জাবে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার বংশীয়গণ বহুদিন যাবৎ নবদ্বীপের প্রাধান্য মানেন নাই। ইহারা সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরভট্টের সন্তান বলিয়া কথিত। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ছয়টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; ইহাদের মধ্যে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীগোবিন্দ, শিব ও অম্বিকার মন্দির প্রধান। শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে। ইহার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রবাদ একবার শত্রুদল কর্ত্তৃক তাঁহার পূজারীর বাটী আক্রান্ত

হইলে তিনি স্বয়ং খাঁড়া হাতে আসিয়া তাহাদের বিনাশ করেন। ধানুকার নিকটবর্ত্তী আমতলী গ্রামের পণ্ডিত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। পালংএর ৩ মাইল পশ্চিমে পালং নদীর অপর পারে **বড় বিনোদপুর** একটি বড় গ্রাম। পূর্ব্বকালে একবার এখানকার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া জমিদারগণের কাছারী লুণ্ঠন করাতে তাহাদের দমন করিবার জন্য সরকারকে ফৌজ পাঠাইতে হয়; গ্রামের বাহিরে যে স্থানে বিদ্রোহীরা ফৌজের সহিত লড়িয়াছিল তাহা "রণখোলা" নামে পরিচিত হইয়া আছে। সেই ঘটনা লইয়া ও অঞ্চলে একটি ছড়া চলিত আছে—

বাজিল রণের কাড়া,
সিপাহী হইল খাড়া,
বিনোদপুরে পইল সাড়া।

.. ..

পালং ছাড়িয়া তারপাশা ষ্টীমার পথে নরিয়া খালের উপর জপসা স্টেশন মাদারীপুর হইতে ১০ ঘণ্টার পথ। **জপসা** একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সমৃদ্ধ ছিল। জপসার ৩।৪ মাইল পশ্চিমে রাজনগরে রাজা রাজবল্লভের বহু মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতি ছিল। পদ্মার একটি শাখা কীর্ত্তিনাশা ইহাদের ধ্বংস করে; সেই হইতে কীর্ত্তিনাশা নাম। রাজনগর, জপসা, ভোজেশ্বর, প্রভৃতি গ্রাম নদী গর্ভে গিয়াছিল; আবার চর পড়িয়া নূতন বসতি হইয়াছে। জপসার দেড় মাইল দক্ষিণে নরিয়া খালের পশ্চিম কূলে ভোজেশ্বর গ্রাম। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীহর্ষ উপাধ্যায়, দুর্গাদাস বেদাচার্য্য, রঘুনাথ বেদান্তবাগী, গোবিন্দদেব শিরোমণি, কৃষ্ণদেব স্মৃতিরত্ন, ভবানীপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি, পার্ব্বতীনাথ বিদ্যাভূষণ, গুরুচরণ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বংশপরম্পরায় জ্ঞানশলাকা জ্বালাইয়া রাখিয়া এই গ্রামকে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। ভোজেশ্বরের অপর পারে নরিয়া খালের পশ্চিম কূলে মাস্তুরা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে প্রসিদ্ধ গ্রাম **ফতেজঙ্গপুর** অবস্থিত। এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণের ইহা প্রধান কেন্দ্র ছিল। বহু পুরুষ ধরিয়া এখানকার জ্যোতিষীগণ পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেন এবং সমগ্র বাংলার পঞ্জিকার সময় গণনা এখানকার পঞ্জিকার সময় ধরিয়া করা হইত। জ্যোতির্বিদদিগের পুরাতন মন্দির ও বাটী এখনও বর্ত্তমান। পূর্ব্বে এই স্থান চাঁদ ও কেদার রায়ের অধিকারে ছিল। তখন ইহার নাম ছিল শ্রীনগর। কথিত আছে, মহারাজ মানসিংহ যখন মুঘল বাহিনী লইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ বশে আনিতে যান সে সময়ে তাঁহার সহকারী কিলমক্ প্রথমে পরাজিত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন মানসিংহ স্বয়ং তাঁহার সাহায্যে আগমন করেন এবং এই যুদ্ধে কেদার রায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ মানসিংহ শ্রীনগর নাম বদলাইয়া ফতেজঙ্গপুর নাম রাখেন। এখনও এই গ্রামের এক অংশ নগর নামে পরিচিত। মাস্তুরার দুই মাইল পূর্ব্বদিকে ধামারণ গ্রামে একটি সূর্য্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মাস্তুরার দেড় মাইল উত্তরে জপসার ঠিক অপর পারে নরিয়া খালের উপর **কানুরগাঁ** একটি পুরাতন গ্রাম। এ অঞ্চলে খ্যাত "কানুরগাঁয়ের বশিষ্ঠ" বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদর মধ্যে আনন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি সমধিক

প্রসিদ্ধ। কান্দুরগাঁয়ের অন্তর্গত বক্সীবাজার পল্লীর রায়-বংশের গোবিন্দচন্দ্র রায় আগ্রা শহরে হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার "কতকাল পরে বল ভারতরে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে" এবং "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" এই গান দুখানি সকলেই শুনিয়াছেন। কান্দুরগাঁয়ের এক মাইল উত্তরে নরিয়া খালের উপর **লোনসিংহ** একটি পুরাতন সমৃদ্ধ গ্রাম। ৺ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন এখানকার স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন সে সময়ে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লোনসিংহ হইতে অবলাবান্ধব নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ফরিদপুর, পালং. মাদারীপুর প্রভৃতি থানার এবং ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি জেলার কয়েকটি থানার প্রতি বর্গ মাইলে ১৩০০ এরও অধিক সংখ্যক লোকের বসতি, পৃথিবীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এত ঘন বসতি আর নাই। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে পশ্চিম ইউরোপের গ্রামাঞ্চল ইহার এক চতুর্থাংশ লোকসংখ্যা বহন করিতে পারে না এবং চীন দেশে যে সকল অংশে কৃত্রিম উপায়ে জল সেচনের ব্যবস্থা নাই, তথায় গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা ১০০০ এর বেশী নয়।

জপসার পরেই তারপাশা স্টীমার পথে **নরিয়া** স্টেশন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের নরিয়া মেলের নাম এই গ্রামের নাম হইতেই হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সোহং স্বামী কিছুকাল এই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে দোস্ত ফিরিঙ্গী নামক একজন পর্ত্তুগীজ বণিক এই গ্রামের একধারে বাস করিতেন, তিনি একজন বাঙালী কৃষকের মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানাদি না হওয়ায় এই গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘটক রায় বংশের ইন্দ্রনারায়ণকে তাঁহাদের সম্পত্তি প্রদান করেন; ইন্দ্রনারায়ণকে তাঁহারা স্নেহ করিতেন। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণ নবাব সরকারের খাজনা বন্ধ করিলে নবাব সৈন্য নরিয়াতে আসিয়া ঘটক রায়দের গৃহ লুণ্ঠন করে, এই সময়ে ছোট খাট একটি যুদ্ধ হইয়াছিল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। সেই যুদ্ধের কাহিনী লইয়া একটি সুন্দর ছড়া রচিত হইয়াছিল, তাহা এ অঞ্চলে এখনও চলিত আছে। ছড়াটি এইরূপ :—

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রইয়া
নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচু বনে রইয়া,
ঘটক পলাইলরে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে।
দিন নাই ক্ষণ নাই রত্রি অন্ধকার,
একুশ দিনে সোনার লঙ্কা হক ছারকার
ঘটক পলাইলরে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে।
.....................তেতৈলের পাতে,
রঘু ঘটক তীর ছাড়ে ডান হাতে বাঁ হাতে
ঘটক পলাইলরে.......................।

নরিয়ার দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে **কেদারপুর** গ্রাম। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায় এই স্থানে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ রাখিয়া

যান; বাড়ীর চারিদিকে পরিখার চিহ্ন এবং বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি আজিও দৃষ্ট হয়। কেদারপুর হইতে মেঘনা আড়াই মাইল পূর্ব্ব দিকে। কেদার রায়ের নাম হইতেই গ্রামের নাম কেদারপুর হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয়; এবং মেঘনার পূর্ব্ব কূলে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর শহরের নাম চাঁদরায় হইতে হইয়াছে এরূপ কেহ কেহ অনুমান করেন। কেদারপুর গ্রামে রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পাল রাজগণের পতনের পর বাংলায় অল্পকাল খড়্গবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন; এই বংশের পতনের পর বৌদ্ধমতাবলম্বী চন্দ্র বংশ বঙ্গে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের অদিপুরুষ পূর্ণচন্দ্র রোহতাসগড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার পৌত্র ত্রৈলোক্য-চন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে (হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে) রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার রাণীর নাম কাঞ্চনা। ইঁহাদের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। কেদারপুর হইতে এক মাইল দক্ষিণে নলতা গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

পাটগাতি—খুলনা-বরিশাল স্টিমার পথে প্রায় ৬ ঘণ্টার পথ। এখান হইতে ঘাঘর নদী দিয়া নৌকাযোগে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্যতম প্রধান স্থান **কোটালীপাড়ায়** যাইতে হয়। ইহা সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সুপরিচিত এবং বহু বিখ্যাত পণ্ডিত এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে, যে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তবংশ হইতেই এককালে ১৬টি টোল চালান হইত; তাহা ছাড়া অন্য টোল তো ছিলই। সম্প্রতি কোটালীপড়ার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বামনদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। "আনন্দ লতিকা" নামক চম্পূ কাব্যের রচয়িত্রী সুপ্রসিদ্ধা জয়ন্তী দেবী এই বংশের কন্যা বলিয়া কথিত। ইঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমও বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

কোটালীপাড়া থানার অন্তর্গত মদনপাড় গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের পুত্র এবং কেশব সেনের ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্র-শাসনদ্বারা মহারাজ বিশ্বরূপ সেন তাঁহার চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে শ্রীবিশ্বরূপ দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুরভাগে কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত এই তাম্রশাসনের বহু অক্ষর আধুনিক বাংলা হরফের মত। বাকী অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলা লিপির প্রাচীন রূপ। (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র সেন)

হুলারহাট—খুলনা-বরিশাল স্টীমার পথে প্রায় ১০ ঘণ্টার পথ। এখান হইতে বাখরগঞ্জ জেলার অন্যতম মহকুমা সদর **পিরোজপুর** ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নামক ক্ষুদ্র নদের দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পিরোজপুর শহরের পত্তন হয়। নিকটস্থ রাজগঞ্জহাট চাউল ও সুপারির বড় গঞ্জ।

পিরোজপুরের ৩ মাইল উত্তরে রায়ের কাঠি নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম। রায়ের কাঠির রায়েরা বাখরগঞ্জ জেলার একটি পুরাতন বংশ। ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। কথিত আছে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মদন মোহন রায় চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গা হইতে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এখানকার পুরাতন কালী মন্দিরের সংস্কৃতে লিখিত

ফলক হইতে জানা যায় যে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে রুদ্রনারায়ণ রায় এই কালীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

হুলারহাট হইতে উত্তর-পূর্ব্বে পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানা হইয়া বানরীপাড়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্টীমার যাতায়াত করে। হুলারহাট হইতে বানরী-পাড়া ৪ ঘণ্টার পথ।

ঝালকাঠি—খুলনা-বরিশাল স্টীমার পথে খুলনা হইতে ৮৭ মাইল দূর। মেল স্টীমারে সাড়ে আট ঘণ্টার পথ। ইহা বরিশাল জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বন্দর। স্থানটি ঝালকাঠি ও নলচিটি নামক ছুইটি নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। ইহা সেগুন কাঠের একটি বড় গঞ্জ। এখান হইতে প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকার দাইল, কলাই, ধান, নারিকেল ও সুপারি চালান যায়।

ঝালকাঠির ৩ মাইল দক্ষিণে **পোনাবালিয়া-সামরাইল** গ্রামে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। এই শিব স্বয়ম্ভূ বলিয়া কথিত ও ত্র্যম্বকেশ্বর ভৈরব নামে পরিচিত। শিবরাত্রির দিন এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং এই উপলক্ষে খুব বড় মেলা হয়। বাখরগঞ্জ জেলার ঝালকাঠি ও বানরীপাড়া থানার লোক সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ১৩০০ এরও উপরে। (মাদারীপুর দ্রষ্টব্য)।

বরিশাল—বাখরগঞ্জ জেলার সদর শহর বরিশাল কীর্ত্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে জলপথে ১০৪ মাইল দূর। মেল স্টীমারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ। খুলনা ও বরিশালের মধ্যে প্রত্যহ ছুই বার স্টীমার যাতায়াত করে। কলিকাতা হইতে ২৪ পরগণা, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার নানা স্থান হইয়া বরাবর খাল দিয়া বরিশাল প্রভৃতি স্থানে নৌকার চলাচল আছে। এই খাল দৈর্ঘ্যে ১,১২৭ মাইল, ইহার মধ্যে মাত্র ৪৭ মাইল কৃত্রিম। খালটি সার্কুলার ও ঈস্টর্ণ খাল নামে পরিচিত। এই খাল দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাযোগে মাল আসিয়া থাকে। এগুলি পৃথিবীর প্রধান খাল পথের অন্যতম। কলিকাতা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত ছুইটি খাল পথ আছে; একটি ভাঙড় খাল দিয়া শিবসা নদীতে পড়িয়া খুলনা এবং তথা হইতে ভৈরব দিয়া পিরোজপুর হইয়া বরিশাল। অপরটি আদিগঙ্গা ও বিদ্যাধরী দিয়া ক্যানিং এবং তথা হইতে সুন্দর বনের জলপথে বরিশাল। বরিশাল শহরের নদী তীর দিয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড নামে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। বহু লোকে সকাল ও সন্ধ্যায় এই রাস্তায় বেড়াইয়া থাকে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানা স্থানে স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে ব্রজমোহন কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ছেলেদের জন্য ছুইটি ও মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। ব্রজমোহন কলেজটি বরিশালের স্বনামধন্য নেতা বাংলার অন্যতম সুসন্তান ৺অশ্বিনী কুমার দত্ত কর্ত্তৃক স্বীয় পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার "ভক্তি যোগ" নামক উপাদেয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। প্রসিদ্ধ স্বদেশী যাত্রা গানের প্রবর্ত্তক মুকুন্দ দাস বরিশালের অধিবাসী ছিলেন।

বরিশাল শহরে খৃষ্টান মিশনারীগণের অনেকগুলি কর্ম্মকেন্দ্র আছে। ১৮৪৪।৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে যে ইংরেজ কলেক্টর ছিলেন, তিনি একটি বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীর সম্মুখে সমারোহে চড়ক পূজা করিতেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেলার সদর বরিশাল শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে **বাখরগঞ্জ** গ্রামে ছিল; ইহা বরিশাল পটুয়াখালি স্টীমার পথে রঙ্গশ্রী স্টেশনের পার্শ্বে অবস্থিত; রঙ্গশ্রী শীতল পাটীর জন্য প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারের কর্ম্মচারী আগা বাখরের নাম হইতে গ্রামটির নাম হইয়াছে বাখরগঞ্জ এবং এই গ্রামে জেলার সদর অবস্থিত ছিল বলিয়া সমগ্র জেলারও নাম হইয়াছে বাখরগঞ্জ। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত আগা বাখর কার্য্যতঃ এই অঞ্চলের সর্ব্বময় শাসক ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি ঢাকায় অবস্থান করিয়া চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নায়েব নাজিমকে হত্যা করিলে পরদিন স্বয়ং ঢাকায় নিহত হন। আগা বাখরের মৃত্যুর পর এ অঞ্চল রাজা রাজবল্লভের অধিকারে আসে। কথিত আছে তিনি নিজ প্রতাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ পরিবার আনাইয়া বাখরগঞ্জ গ্রামের ৩ মাইল দক্ষিণে শিবপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করান। এই গ্রামে এখনও একটি পর্ত্তুগীজদিগের গীর্জ্জা আছে এবং গ্রামটি পাদ্রী শিবপুর নামেও অভিহিত হয়। এখানকার গীর্জ্জাটি ও খৃষ্টানগণ মাদ্রাজের মায়লাপুরের বিশপের ডাইওসীসের অন্তর্গত। বাখরগঞ্জ-শিবপুর অঞ্চল চাউল ও সুপারির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। শিবপুরের ডোমিঙ্গো ডিসিল্ভা নামক এক ব্যক্তি চাউলের কারবারে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার চরম পত্র অনুসারে খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু দরিদ্রদিগের মধ্যে ৫০০৲ টাকা বিতরিত হয়।

বরিশাল হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে **সুজাবাদ** গ্রামে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সম্রাট সাজাহানের পুত্র শাহ সুজা যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন, তখন মগদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা জন্য এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুজাবাদ গ্রাম এখনও শাহ সুজার নাম বহন করিতেছে।

বরিশাল হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে **লাখুটিয়া** গ্রামে রায় উপাধিধারী প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের বাস। লাখুটিয়া হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটি কাটা খাল আছে। এই রায়-বংশের ৺ইন্দ্রলাল রায় প্রথম বাঙালী বৈমানিক সেনানীর কার্য্য করেন; গত মহাযুদ্ধে তিনি অনেকগুলি শত্রুপক্ষীয় বিমানপোত ধ্বংস করিয়া অবশেষে বীরের মত নিহত হন।

মাধব পাশা—বরিশাল শহর হইতে ৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে মাধব পাশা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম। বরিশাল হইতে মাধব পাশা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে।

মুঘলযুগে বাখরগঞ্জ জেলা সরকার বাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপূর্ব্বে এই অঞ্চলের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এখনও এখানকার পরগণার নাম বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ। প্রবাদ, ইতিহাস বিশ্রুত রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের গুরু তপস্বী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর

নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। কথিত আছে, একদিন রাত্রিকালে নৌকায় নিদ্রাকালীন চন্দ্রশেখরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে নৌকার নিকটস্থ জলমধ্যে স্থিত বিগ্রহ তিনি যেন উঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কথামত দনুজমর্দ্দনদেব জলে ডুব দিয়া কাল পাথরের দুইটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। আজও মাধবপাশায় এই দুটি মূর্ত্তি কাত্যায়ণী ও মদন গোপাল পূজিত হইতেছেন।

মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ রাজগণের শেষ রাজধানী। এই গ্রামে অনেক ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। দুর্গাসাগর নামক একটি সুবৃহৎ প্রাচীন দীঘি বর্ত্তমান আছে, উহা রাজা জয়নারায়ণের মাতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাজারের নিকট কামান-তলায় একটি পিতলের কামান পড়িয়া আছে। দনুজমর্দ্দনদেবের বংশের পুরুষশাখা কিছু কাল পরে লুপ্ত হইলে, এই বংশের কন্যাশাখার বসু-বংশীয় পরমানন্দ রাজ্যাধিকার পান। ইঁহার প্রপৌত্র রাজা কন্দর্পনারায়ণ পটুয়াখালী মহকুমার বৌফল থানার অন্তর্গত তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত পুরাতন রাজধানী কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কচুয়া পরিত্যাগ করিবার কারণ কেহ বলেন মগের অত্যাচার, আবার কেহ বলেন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ বার ভূঁইয়াদিগের অন্যতম ছিলেন এবং মাধবপাশায় ১৪।১৫ বৎসর সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ বীর ও সাহসিক ছিলেন। দেশ রক্ষার্থ মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ভ্রমণকারী র‍্যাল্ফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লায় আগমন করেন। ফিচের বিবরণী হইতে কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বের কথা জানা যায়। তিনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং প্রতাপের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন। জেসুইট্ পাদ্রী ফন্‌সেল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর যাইবার পথে বাক্‌লায় নয় বৎসর বয়স্ক রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; ফন্‌সেল ইঁহাকে অমায়িক ও বুদ্ধিমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্রের সহিত পিতৃবন্ধু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা রাজকুমারী বিমলার বিবাহ হইয়াছিল। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্রের মধ্যে বিবাহরাত্রে মনোমালিন্য ঘটায় রাজপুত্রী বিবাহের পর অনেক দিন পিত্রালয়ে অবস্থান করেন। বহুকাল পরে প্রতাপাদিত্যের অনুমতি লইয়া বিমলা অনেকগুলি নৌকায় পিত্রালয়ের বহুবিধ উপহার লইয়া স্বামীর রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন। মাধবপাশার নিকট আসিয়া তিনি নৌকা বাঁধিলেন, আশা করিয়াছিলেন সংবাদ পাইয়া রাজা রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। কিন্তু রামচন্দ্র আসিলেন না, এদিকে রাণীকে দেখিবার জন্য রাজ্যের নানা স্থান হইতে প্রজার দল তথায় আসিতে লাগিল। দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণ বিমলার নিকট বহু অর্থ পাইল, ক্রমে সে স্থানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল এবং ইহা "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত হইল। এইরূপ বহুদিন নৌকায় অবস্থানের পর রামচন্দ্র আসিয়া পত্নীকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। এই কাহিনীকে আংশিক ভাবে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "বৌঠাকুরাণীর হাট" রচিত। রামচন্দ্র ও বিমলা কীর্ত্তিনারায়ণ ও বাসুদেব নামে দুইটি সাহসী ও বীর পুত্র সন্তান লাভ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কীর্ত্তিনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন,

ইনি জলযুদ্ধে পারদর্শী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের পৌত্র প্রেমনারায়ণের মৃত্যুতে বসু বংশের পুরুষধারা লুপ্ত হয় এবং প্রেমনারায়ণের জামাতা গৌরীচরণ মিত্র সম্পত্তির অধিকারী হন। এই মিত্র বংশীয়গণ আজও মাধবপাশায় অবস্থান করিতেছেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বাকী খাজানার দায়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ পরগণা বিক্রীত হইয়া এই পুরাতন বংশের হস্তচ্যুত হয়।

কচুয়া—বরিশাল পটুয়াখালি স্টীমার পথে পটুয়াখালির আগের স্টেশন বাগা বন্দর হইতে পূর্ব্বে ১০ মাইল দূরে বৌফল থানার নিকটেই তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম কূলে কচুয়া গ্রাম। বাগা হইতে বৌফল পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। বাগা বালাম চাউলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। মেঘনার শাখা তেতুলিয়া নদী বাখরগঞ্জ জেলার পূর্ব্বাংশ সুবৃহৎ দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপটিকে জেলার অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সাহাবাজপুর দ্বীপের পূর্ব্বদিকে বিশাল মেঘনা প্রবাহিতা, ইহার অপর পারে নোয়াখালি জেলা।

কচুয়া মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেবের বংশীয় চন্দ্রদ্বীপ রাজগণের আদি বাসস্থান। এই স্থান হইতেই রাজা কন্দর্পনারায়ণ রাজধানী উঠাইয়া মাধবপাশায় লইয়া যান।

পাণ্ডুয়ায় এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের নানা স্থানে দনুজমর্দ্দন দেবের অনেকগুলি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে (১৪১৭, ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত। মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায় যে ১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ দনুজমর্দ্দন দেবের অধিকারে ছিল। মহারাজ গণেশের পুত্র গৌড়রাজ জালাল উদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা ফিরোজাবাদে ৮১৮, ৮১৯, ৮২২, ৮২৩, ৮২৮ ও ৮৩৪ হিজরায় মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু ৮২০ এবং ৮২১ হিজরায় মুদ্রিত তাঁহার কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে ৮২০ ও ৮২১ হিজরায় অর্থাৎ ১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জালাল উদ্দীন মহম্মদশাহ পরাজিত হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হন। স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ দনুজমর্দ্দনদেব নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার মুদ্রার একদিকে বাংলা অক্ষরে নিজ নাম এবং অপরদিকে "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" লিখিত আছে। দনুজমর্দ্দন ব্যতীত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে মুসলমান অধিকৃত আর্য্যাবর্ত্তের কোনও স্থানে কোনও হিন্দু রাজা ভারতীয় লিপি ও ভাষায় স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ইহা তাঁহার প্রতাপ ও সাহসিকতার পরিচায়ক। উত্তর বঙ্গে পাণ্ডুয়া হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ পর্য্যন্ত দনুজমর্দ্দনদেবের অধিকারে ছিল। অনুমান হয় ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার দুই এক বৎসর পরেই তিনি পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ হইতে বিতাড়িত হন। ফিরোজাবাদে জালাল উদ্দীন মহম্মদ শাহের নামে ৮২২ হইতে ৮২৪ হিজরায় অর্থাৎ ১৪১৯ হইতে ১৪২১ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গে মহেন্দ্রদেবের ১৪১৮ হইতে ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত অনেকগুলি রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পাণ্ডুয়া হস্তচ্যুত হইবার পর দনুজমর্দ্দনদেবের বংশের রাজ্য সীমা বাকলা চন্দ্রদ্বীপেই পর্য্যবসিত হয়। বহুকাল তাঁহারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

কচুয়ার কমলসাগর নামে প্রকাণ্ড দীঘি এই বংশের প্রতিষ্ঠিত। রাজা জয়নারায়ণদেবের কন্যা কমলা এই দীঘিটি কাটাইয়াছিলেন। কথিত আছে, পুষ্করিণীটি খননের পর কমলা স্বপ্ন পান যে তিনি পুষ্করিণীটি হাঁটিয়া পার না হইলে উহাতে জল উঠিবে না। তদনুসারে তিনি উহা হাঁটিয়া পার হইতে গেলে মধ্য পথে যাইতে না যাইতে চারিদিক হইতে জল উঠিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে; তদবধি তিনি এই দীঘিতে পদ্ম ফুলে পরিণত হইয়া আছেন। কমলার চারিদিকে জল আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে শীঘ্র উপরে আসিতে বলিলে তিনি বলেন তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। তিনি আরও বলিলেন যে তাঁহার একমাত্র শিশু সন্তানটিকে প্রতিদিন ঘাটে রাখিয়া গেলে তিনি তাহাকে স্তন্যদান করিবেন। সেইমত শিশুটিকে প্রত্যহ সকালে ঘাটে রাখিয়া আসা হইত এবং কমলা জল হইতে উঠিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য একদিন সকালে ঘাটের নিকট লুকাইয়া রহিলেন এবং কমলা উঠিয়া আসিয়া যখন শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। কমলা পলাইয়া সেই যে জলে লুকাইলেন তাহার পর আর কখনও উঠেন নাই।

কচুয়ায় পুরাতন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু এখনও দৃষ্ট হয়। কচুয়ার নিকটবর্ত্তী বৌফল থানার অন্তর্গত কালালিয়া গ্রামে খুব বড় হাট বসে। এ অঞ্চলের মুগের দাইল অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত।

শিকারপুর—বরিশাল শহর হইতে ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত শিকারপুর গ্রাম ভারতের একপঞ্চাশৎ শক্তি পীঠের অন্যতম পীঠ। গ্রামটি সুগন্ধা বা সুনন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে বিষ্ণুচক্রচ্ছিন্ন সতী দেহের নাসিকা পড়িয়াছিল। এই স্থানে দেবীর নাম সুগন্ধা বা উগ্রতারা। দেবীর ভৈরব ত্র্যম্বকেশ্বর ঝালকাঠির নিকটবর্ত্তী পোনাবালিয়া-সামরাইল গ্রামে অবস্থিত; কথিত আছে, পূর্ব্বকালে পোনাবালিয়া-সামরাইলের পার্শ্ব দিয়া সুগন্ধা নদী প্রবাহিত ছিল; শিকারপুর ইহার পূর্ব্বকূলে এবং পোনাবালিয়া-সামরাইল পশ্চিমকূলে অবস্থিত ছিল। শিবরাত্রির সময়ে শিকারপুরে খুব বড় মেলা বসে। কোজাগরী পূর্ণিমা হইতে শ্যামাপূজার দিন পর্য্যন্ত এবং দোলযাত্রা উপলক্ষেও এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বরিশাল শহর হইতে মোটরবাস, মোটর লঞ্চ ও নৌকাযোগে শিকারপুর যাওয়া যায়।

গৈলা—বরিশাল মাদারীপুর-তারপাশা স্টীমার পথে বরিশাল শহর হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরনদী স্টেশনে নামিয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম গৈলায় যাইতে হয়। গৌরনদী হইতে গৈলা প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে। গৈলা এক সময়ে পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত ত্রিলোচন কবিকণ্ঠাভরণ গৈলার অধিবাসী ছিলেন। এখানে কবীন্দ্র কলেজ নামে একটি সংস্কৃত কলেজ আছে; গৈলা নিবাসী পণ্ডিত ৺ মদনমোহন কবীন্দ্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

গৈলা গ্রাম হইতে ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে **ফুল্লশ্রী** গ্রাম "পদ্মাপুরাণ" বা "মনসামঙ্গল" গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় গুপ্তের জন্ম হয়। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "মনসামঙ্গল" রচনা করেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসা দেবীর বিগ্রহ আজও এখানে নিত্য পূজা পাইতেছেন। বিজয় গুপ্তের মনসা খুব জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস, এজন্য নানাস্থান হইতে এখানে যাত্রীর সমাগম হয়।

গৌরনদী হইতে ২ মাইল পশ্চিমে **চাঁদসী** অবস্থিত। চাঁদসীর দেশীয় চিকিৎসকগণ বাংলায় প্রসিদ্ধ।

ইদিলপুর—বরিশাল-চাঁদপুর-ঢাকা স্টীমার পথে **বদরটুনি** স্টেশন বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর সীমান্তে নয়াভাঙ্গানী ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নয়াভাঙ্গানীর অপর পারেই ফরিদপুর জেলা। নয়াভাঙ্গানীর নাম হইতে প্রতীয়মান হয় ইহা পদ্মার নূতন খাত। বদরটুনি থানার ২।৩ মাইল পশ্চিমে নয়াভাঙ্গানী নদীর উপর আবুপুর বা ইদিলপুর গ্রাম। ইদিলপুর পরগণা পুরাতন সরকার বাক্লার চারিটি পরগণার অন্যতম। চাঁদ রায় কেদার রায়ের সময় ইহা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল; পরে কেদার রায়ের সেনাপতি রঘুনন্দন চৌধুরী ইহা প্রাপ্ত হন। চৌধুরীরা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমিদার ছিলেন। ভাটগানে শুনা যায় "ইদিলপুরের জমিদার দোহাই মানে বাঘে যার।" এই পরগণায় প্রচুর সুপারি এবং কিছু কিছু কমলা লেবু জন্মিয়া থাকে।

ইদিলপুর পরগণার কোনও গ্রামে সেন বংশীয় রাজা কেশব সেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ১১৩৬ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে রাজা কেশব সেন তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ঈশ্বর দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে জেলার দক্ষিণাংশে চণ্ডভণ্ড নামক একটি আদিম ও অর্দ্ধসভ্য জাতির অত্যাচার দমন করিবার জন্য তিন খানি গ্রাম দান করেন। কেশব সেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। এই তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে শ্রীক্ষেত্রে, বারাণসীতে, বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণীতে "সমর জয় স্তম্ভ মালা" স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইদিলপুর পরগণার অপর একটি গ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র-দেবের (মাদারীপুর দ্রষ্টব্য) একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

পটুয়াখালি—বরিশাল শহর হইতে স্টীমার পথে দক্ষিণে প্রায় ৭ ঘণ্টার পথ। ইহা একটি মহকুমা সদর। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে যখন প্রথম দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় তখন ইহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ক্রমে ইহা শহরে পরিণত হইয়াছে।

পটুয়াখালি হইতে দক্ষিণে এক দিকে আমতলি ও অপর দিকে খেপুপাড়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্টীমার যাতায়াত করে।

পটুয়াখালি-আমতলি স্টীমার পথে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বিঘাই ও আয়লা নদীর সঙ্গমস্থলে আয়লা স্টেশনে পৌঁছান যায়। আয়লা নদীর অপর বা উত্তর পারে **মসজিদবাড়ী** গ্রাম। এখানে ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন মসজিদ আছে; ইহা সরকারী রক্ষিত কীর্ত্তি বিভাগের অধীন। কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত এই মসজিদের প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে ইহা সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র সুলতান বারবক্ শাহের রাজ্যকালে খান্ মোয়জ্জম আজিয়াল খান্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ

বঙ্গে ইহাই মুসলমান শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদ ও নিদর্শন। পটুয়াখালি হইতে আমতলি থানা প্রায় ৪ ঘণ্টার রাস্তা; এখানে অনেক মগের বাস আছে।

পটুয়াখালি-খেপুপাড়া স্টীমার পথে **গলাচিপা**, ৪ ঘণ্টার রাস্তা; এই থানায় বহু মগ বাস করেন। গলাচিপা হইতে কিঞ্চিদধিক আরও ৪ ঘণ্টা দক্ষিণে যাইলে নীলগঞ্জ নদীর উত্তর কূলে **খেপুপাড়া** গ্রাম। এখানকার খেপু নামধেয় জনৈক মগ অধিবাসীর নাম হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে খেপুপাড়া। ইহা টিয়াখালী নামক সরকারী আবাদের অংশ। এখান হইতে নৌকাপথে বাহির সমুদ্রের উপর কুয়াকাটা গ্রাম নিকটেই। কুয়াকাটার এক মাইল পূর্ব্বে লাটাচাপনি গ্রামে সাগর সৈকতে একটি বালিয়াড়ির উপর একটি সুন্দর ডাক-বাংলা আছে। এখানকার সমুদ্রের দৃশ্য অতি মনোরম।



নদী পথের দৃশ্য

ভোলা—বরিশাল-সন্দীপ-চট্টগ্রাম স্টীমার পথে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমা সদর এই গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। তদানীন্তন সদর আলা ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত আই সি এস্ মহাশয় স্থানটি নির্ব্বাচন করেন। ইহা তেতুলিয়া বা ইলসা নদীর পূর্ব্বকূলে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখন ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুপারি, লঙ্কা, নারিকেল এবং পানের কারবারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

দৌলতখাঁ—বরিশাল-সন্দীপ-চট্টগ্রাম স্টীমার পথে ভোলার এক স্টেশন পরে সাহাবাজপুর দ্বীপে মেঘনা নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বন্যায় ইহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা সুপারির কারবারের একটি বিশেষ কেন্দ্র। এ অঞ্চলে

মেঘনার বান প্রসিদ্ধ। সারা বৎসর ধরিয়াই এই বান দৃষ্ট হয়; কিন্তু জোয়ারের সময়ে ইহা বিরাট আকার ধারণ করে এবং ১৪।১৫ ফুট উচ্চ হইয়া জলরাশি আসিতে দেখা যায়; গভীর জলে ইহা বিশেষ বুঝা যায় না। দেউলার বান দক্ষিণ সাহাবাজ দ্বীপ এবং নোয়াখালি জেলার হাতিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়া আসিয়া মেঘনা নদী এবং সংশ্লিষ্ট জলপথ দিয়া উত্তরে উঠিতে থাকে; অপর দিকে চাটগাঁর বান সন্দ্বীপ ও নোয়াখালির মধ্য দিয়া উপরে আসিয়া প্রথমতঃ পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়া দেউলার বানের সম্মুখীন হয়। দেউলার বানের আঘাত খাইয়া ইহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।



(ঘ) রাণাঘাট-লালগোলাঘাট-গোদাগাড়ীঘাট-কাটিহার

বীরনগর—কলিকাতা হইতে ৫১ মাইল দূর। চূর্ণীনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার পুরাতন নাম উলা। প্রবাদ উলুবনের জঙ্গল কাটিয়া গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল উলা। কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানী অর্থে ইরাণীয় শব্দ আউল হইতে উলা হইয়াছে। অপর মতে আরব্য শব্দ "উলা" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান হইতে উলা নামের উৎপত্তি; পুরাকালে এই সমৃদ্ধ গ্রামটির প্রাধান্য নাম হইতে সূচিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এতদঞ্চলে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। উলার অধিবাসিগণ কয়েকবার ডাকাতের দল ধরিয়া প্রভূত সাহসের পরিচয় দেন বলিয়া তদানীন্তন কলিকাতা কোর্ট অব্ সার্কিটের জজ সাহেবের প্রস্তাবে সরকার কর্ত্তৃক গ্রামটিকে বীরনগর আখ্যা প্রদত্ত হয়।



দ্বাদশ মন্দির, বীরনগর

অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন স্বরূপ বড় বড় বাড়ী, দীঘি, প্রাচীন গড়ের খাত ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি আজিও এখানে দৃষ্ট হয়। বীরনগরের পুরাতন খ্যাতি ও বনিয়াদী কুলমর্য্যাদা এ অঞ্চলে প্রচলিত গ্রাম্য ছড়াতে স্থান পাইয়াছে, যথা—

উলার মেয়ে কুলকুন্টি*, নদের মেয়ের খোপা;
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা

* কুল কুন্টি—কুলগর্ব্বিতা (নদীয়া-কাহিনী, কুমুদ নাথ মল্লিক)

উলায় পূর্ব্বে কয়েকটি টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। এখানকার প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, শিবশিব তর্করত্ন, ভবানীচরণ ন্যায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন ও কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। অত্রত্য সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানের জন্য সেকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্য গৌরবের জন্য উলা প্রসিদ্ধ ছিল।

এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে বটবৃক্ষতলে প্রাচীন উলাইচণ্ডী দেবী, দ্বাদশ মন্দির, মুস্তৌফিদের জোড় বাংলা, ভক্তিবিনোদ কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের জন্মভিটা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। উলাই চণ্ডীর পুরাতন পূজাপদ্ধতি, যথা হাড়ীজাতীয় ব্যক্তি দ্বারা চণ্ডীর

প্রথম পূজা এবং শূকর বলিদান প্রভৃতির প্রবাদ হইতে অনেকে মনে করেন এই মূর্ত্তি বৌদ্ধ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাই চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী মেলা হয় এবং এই সময়ে বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির বারোয়ারী পূজা হয়। রোগ শান্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এই বিশ্বাসে উলাই চণ্ডীর বট বৃক্ষের শিকড়ে লোকে ইট বাঁধিয়া পূজা দিয়া থাকে।

এক সময়ে ভাগীরথী বীরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমান বীরনগর গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমেসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর জলাভূমি দেখা যায় অনেকে অনুমান করেন যে উহাই ভাগীরথীর



জোড় বাংলা মন্দির, বীরনগর

প্রাচীন খাত। কবিকঙ্কণের চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শ্রীমন্ত সদাগর যখন সিংহলে যাইতেছিলেন তখন উলার নীচে গঙ্গার দহে ভীষণ ঝড় উঠায় তিনি জাহাজ নোঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উলাই চণ্ডী দেবীর পূজা করিয়া নৌবহর সমেত রক্ষা পাইয়াছিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত উলা নিবাসী কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভাগীরথী বা গঙ্গা তীরে উলার অবস্থান এবং উলাই চণ্ডী বা উলুই চণ্ডীর মেলা সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। যথা—

অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে,
রাখিয়া দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলায় গতি বট মূলে ভগবতী,
যথায় পাতকী নহে ছাড়া॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়।
নৃত্য গীত নানা নাট দ্বিজ করে চণ্ডী পাঠ,
মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়॥

সুপণ্ডিত ও বঙ্গ ভাষায় কয়েক খানি দার্শনিক ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা দ্বারভাঙ্গা রাজের ম্যানেজার চন্দ্রশেখর বসু এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের "বীরাঙ্গনার পত্রোত্তর কাব্য" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কবি হেমচন্দ্র মিত্র বীরনগরের অধিবাসী ছিলেন।

বীরনগর এক সময়ে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারীতে এই সমৃদ্ধ পল্লীটি বিধ্বস্ত হইয়া যায় সম্প্রতি কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎসাহের সহিত গ্রামে ম্যালেরিয়া দমনের কার্য্য চলিতেছে এবং বহু বিঘা জমি লইয়া এই স্থানে একটি স্বাস্থ্যকর আদর্শ পল্লী বসতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

বীরনগরে বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, দৈনিক বাজার, পানীয় জলের নলকূপ প্রভৃতির সুবিধা আছে।

বীরনগরের পার্শ্ববর্ত্তী পালিতপাড়া গ্রামে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কানাইলাল ও নীলমণি আচার্য্য নামক দুই সহোদর দেবী প্রতিমা সাজাইবার সুপ্রসিদ্ধ "ডাকের সাজের" উদ্ভাবন করেন।

কৃষ্ণনগর সিটি—কলিকাতা হইতে ৬২ মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার সদর শহর। কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর দিয়া জলঙ্গী নদী প্রবাহিতা। জলঙ্গী নদীয়া জেলার উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার নিকটে পদ্মা হইতে উঠিয়া কিছু দূর এই দুই জেলার সীমা রক্ষা করিয়া কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনের কিছু উত্তরে লালগোলা লাইনের নীচ দিয়া চলিয়া গিয়া নবদ্বীপের বিপরীত দিকে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। এককালে গঙ্গার প্রধান ধারা জলঙ্গী দিয়া বহিত। (পাবনা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের নাম ছিল রেউই। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব পূর্ব্ব বাসস্থান মাটিয়ারী ("বাণপুর" স্টেশন দ্রষ্টব্য) ত্যাগ করিয়া এই স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং উহার চতুর্দ্দিক পরিখার দ্বারা বেষ্টিত করেন। এই পরিখা "শহর পানার গড়" নামে পরিচিত। রাজা রাঘবের পুত্র মহারাজ রুদ্র এই স্থানের নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। কথিত আছে, তৎকালে রেউইএ অনেক গোপের বসতি ছিল এবং তাহারা মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিত। এইজন্য রুদ্র রেউই এর নাম কৃষ্ণনগর রাখেন। রুদ্ররায়ের সময়ে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বাদশাহকে ২০ লক্ষ টাকা কর দিতেন। রুদ্রের পৌত্র রঘুরাম বীরত্বের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় ধনুর্দ্ধারী এদেশে কেহ ছিল না। বারাকোটির যুদ্ধে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং রাজশাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি আলী মহম্মদকে তীর বিদ্ধ করিয়া নিহত করেন। সাধারণের নিকট তিনি "রঘুবীর" নামে পরিচিত ছিলেন। রঘুরামের পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়া রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের সহিত যোগদান করায় পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি কামান তিনি ক্লাইভের নিকট হইতে উপহার লাভ করেন। ঐ কামানগুলি আজিও

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্র, সঙ্গীত ও অস্ত্রচালনা বিদ্যা সযত্নে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাগম হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া মহাকবি ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। উদ্ভটকবি রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর নামও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চৌরাশী পরগণা ও চারি সমাজের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের সময়ে এই বিস্তীর্ণ অধিকার ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হয়। নদীয়া রাজবংশের বহু কীর্ত্তিকলাপ আজিও বিদ্যমান আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র কয়েকটি সাধন সঙ্গীতের রচয়িতা।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে নদীয়া রাজপ্রাসাদ, রাজবংশের ঠাকুর বাড়ী ও কৃষ্ণনগর কলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজবাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মহাসমারোহে "বার দোল" পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে নদীয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে দ্বাদশটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে আনিয়া একসঙ্গে দোলায় বসানো হয়। মৃৎশিল্পের জন্য কৃষ্ণনগরের খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত। শহরের অন্তঃপাতী গোয়াড়ি ও ঘুর্ণী নামক স্থানে বহু কুম্ভকারের বাস। নানা প্রকার দেব প্রতিমা, জীবজন্তু, ফল, পুষ্প, মডেল ও তৈজসপত্রাদি নির্ম্মাণে ইহাদের কৃতিত্ব অতি অদ্ভুত। শিল্পচাতুর্য্য ও বর্ণকৌশল এমন সুন্দর যে জিনিষগুলি দেখিলে স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক ইহাদের শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। শিল্প চর্চ্চার এই বিশেষ বিভাগে ইহারা বাংলার গৌরব আজিও সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঘুর্ণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসিদ্ধ সভাসদ বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের জন্মস্থান বলিয়া কথিত।

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্" নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নদীয়া রাজবংশের বিবরণীর সম্পাদক দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র বিখ্যাত কবি—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সাধারণের নিকট ডি, এল, রায় নামে সমধিক পরিচিত) কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত স্বদেশী সঙ্গীত ও হাসির গান এখনও লোকের মুখে মুখে ফিরে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে জন্মতিথি উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে কবির জন্মভিটায় সাহিত্যিকগণ সমবেত হন। এদেশের আদালতে প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার সুবিখ্যাত মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ব্যারিষ্টার ও অসাধারণ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্ব নিবাস বিক্রমপুরে হইলেও ইহাদের পিতার আমল হইতে ইহারা কৃষ্ণনগরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া-ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। লালমোহন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য ইংরেজীতে সুন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন। "বাঙ্গালা ব্যকরণ" প্রণেতা লোহারাম শিরোরত্ন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার ভাগিনেয় সুপণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ও কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রতিপালিত হন। "রাজস্থানের পুরাবৃত্ত", "জয়াবতীর উপাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ও কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। বাংলা ভাষায় বহু বালবোধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িতা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ জগদানন্দ রায়ও কৃষ্ণনগরের লোক ছিলেন। পুণ্যশ্লোক শিক্ষাব্রতী রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও এখানকার অধিবাসী ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে "সর ভাজা" ও "সরপুরিয়া" নামক মিষ্টান্ন বিশেষ বিখ্যাত।



নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি, দেপাড়া

কৃষ্ণনগরের দুই মাইল দক্ষিণে দোগাছিয়া গ্রামে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মূলার মহোৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয়। এই সময়ে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ প্রভুর একটি পাগড়ী প্রদর্শিত হয়।

কৃষ্ণনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবপল্লী বা দেপাড়া নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই স্থানে নৃসিংহদেবের একটি অতি প্রাচীন বিগ্রহ আছে। এতদঞ্চলে এই নৃসিংহের মাহাত্ম্য খুব বেশী। ইহার প্রসাদী অন্নের দ্বারা স্থানীয় নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। নদীয়া রাজ বংশের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে এই দেব

বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। এই বিগ্রহ কাহার দ্বারা কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা যায় নাই। স্থানীয় লোকে ইহাকে অনাদি বা স্বয়ং-প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে উৎসব হইয়া থাকে।

পথের পার্শ্বে একটি জঙ্গলাবৃত উচ্চ ভূখণ্ডের একাংশে নৃসিংহদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটিও অতি প্রাচীন। মন্দির প্রাঙ্গনটির ইতস্ততঃ ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টক পড়িয়া আছে। অনুমান হয়, বহু পূর্ব্বে এই দেবতার মন্দির হয়ত খুবই বড় ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষের উপরই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গনের একদিকে কয়েক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ বেলে পাথর পড়িয়া আছে; ইষ্টকস্তূপের মধ্যে নানা মাপের ইট দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার অতি প্রাচীন ও কারুকার্য্যখচিত।

নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি এক বৃহৎ কষ্টি পাথরের উপর খোদিত। ইহার উচ্চতা প্রায় চারি ফুট; পদতলে প্রহ্লাদ ও অঙ্কে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। বহু স্থানেই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা হয় না, কিন্তু লোকে এই বিগ্রহকে "অনাদি" বলিয়া বিশ্বাস করে বলিয়া ইহার পূজা যথা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি যে এই মূর্ত্তির অঙ্গে একখানি পরশ পাথর ছিল, জনৈক লোভী সন্ন্যাসী উহা অপহরণ করিবার জন্যই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি ঘটাইয়াছে।

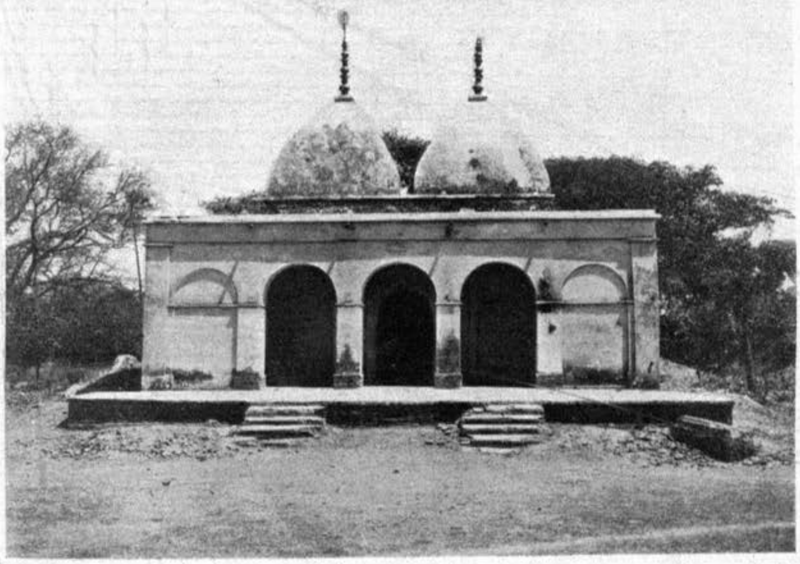
দেপাড়া গ্রামটি একটি প্রকাণ্ড বিলের পার্শ্বে অবস্থিত। এই বিলের একাংশের নাম চামটার বিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিল হইতে একটি ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত অতি সুন্দর উগ্রতারা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে চামটার বিল কথাটি সম্ভবতঃ চামুণ্ডার বিল কথার অপভ্রংশ। এককালে হয়ত এই বিলের নিকটে কোন স্থানে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির ছিল।

একটি ছোট মাপের লাইন কৃষ্ণনগর সিটি হইতে এক দিকে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী শান্তিপুরে এবং অপর দিকে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

দীঘনগর - ছোট লাইনে কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৬ মাইল এবং শান্তিপুর হইতে ৪ মাইল দূর। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এখানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান। দীঘি হইতেই স্থানের নাম দীঘনগর হয়। ১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ) রাঘব এই দীঘির তীরে এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি শ্লোকে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

আমঘাটা—কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৫ মাইল দূর। আমঘাটার অনতিদূরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত হরিহরের মন্দির অবস্থিত। এই স্থানটির পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বে অলকানন্দা নামে একটি নদী প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর সহিত সংযোগ থাকায় ইহার জল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। অধুনা উহার স্রোত একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অলকানন্দার তীরে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং

উহার নাম রাখেন "গঙ্গাবাস"। প্রাসাদের নাম হইতে স্থানটিও গঙ্গাবাস নামে পরিচিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাবাসে হরিহর মূর্ত্তি এবং আরও ছয়টি দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূজার জন্য ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাও করেন। বর্ত্তমানে একমাত্র হরিহর ও কালভৈরবের মন্দির ছাড়া গঙ্গাবাসের পূর্ব্ব গৌরবের আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান শতকের প্রারম্ভে গঙ্গাবাসের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ হইতে চারিটি কামান পাওয়া যায়। ঐ কামানগুলি বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। হরিহর মন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—



হরিহর মন্দির, গঙ্গাবাস

"গঙ্গাবাসে বিধি শ্রুত্যনুগত সুকৃত ক্ষৌণীপালে সকেহস্মিন্
শ্রীযুক্তঃ বাজপেয়ী ভুবি বিদিত মহারাজরাজেন্দ্র দেবঃ।
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহর ভিদামজ্ঞতাং পামরাণাং
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়া স্থাপয়ল্লোলয়াচ॥"

অর্থাৎ—

অজ্ঞ পামরগণ বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে যে ভেদ বুদ্ধি করে তাহা নিরসনের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞকারী মহারাজ রাজেন্দ্র যথাবিধি অনুসারে এই গঙ্গাবাসে অদ্বৈতব্রহ্ম হরিহরের মন্দির স্থাপন করিলেন।

কথিত আছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বহু আয়াসে ও অর্থব্যয়ে চিত্রকূট হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আনিয়া গঙ্গাবাসে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা এখনও দৃষ্ট হয়। ?কালে গঙ্গাবাস হরিহরক্ষেত্র ও মহাবারাণসী নামেও পরিচিত হইত।

আমঘাটা স্টেশনের নিকটে প্রাচীন **সুবর্ণ বিহারের** ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজবংশ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুবর্ণ বিহার নামটিই এই মতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পোষক। এই ধ্বংসাবশেষ প্রায় দুই বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত এবং প্রায় ১০ হাত উচ্চ। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই স্তূপ হইতে বহু ইষ্টকাদি লইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়াছে।

প্রবাদ যে, প্রাচীন কালে এখানে সুবর্ণ নামে একজন কুম্ভকার জাতীয় রাজা বাস করিতেন। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সপরিবারে মৃত্তিকা নিম্নস্থ নিরাপদ গৃহে প্রবেশ করেন এবং পরে দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ নির্গমনের পথ না পাইয়া সেখানেই চিরদিনের জন্য সপরিবারে সমাহিত হন।

বর্ত্তমানে সুবর্ণ বিহারের ধ্বংস স্তূপের উপর গৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়া উহার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ নিত্য সেবা প্রাপ্ত হইতেছেন।

নবদ্বীপঘাট—কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৮ মাইল দূর। গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গম স্থলের উপর এই স্থান অবস্থিত। এখানে নামিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ শহর নবদ্বীপ ও পূর্ব্বপারস্থ (জলঙ্গী নদীর উত্তর পারে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত) মায়াপুরে যাইতে হয়। (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "নবদ্বীপধাম" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। এই স্থানটির প্রকৃত নাম স্বরূপগঞ্জ। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের গোদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত। ইহার নিকটবর্ত্তী "সুরভিকুঞ্জ" ও "স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ" বৈষ্ণবগণের দ্রষ্টব্য স্থান। স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী ও সমাধি মন্দির বিরাজমান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর ভজন কুটীরও এই কুঞ্জ মধ্যে অবস্থিত।

নবদ্বীপঘাট হইতে নৌকাযোগে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী পার হইয়া পদব্রজে বা গরুর গাড়ীতে করিয়া **মায়াপুরে** যাইতে হয়। ইহাকে স্থানীয় কেহ কেহ মিঞাপুর বলিয়া থাকেন। স্টেশন হইতে মায়াপুরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। নবদ্বীপঘাটের ঠিক্ পূর্ব্ববর্ত্তী স্টেশন মহেশগঞ্জে নামিয়াও পদব্রজে মায়াপুরে যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী।

বহু পণ্ডিত, ভক্ত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই স্থানই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বতটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত শহর নবদ্বীপকে তাঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর হইতে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর গঙ্গার ভাঙ্গনে নদীসাৎ হইবার উপক্রম হইলে এই স্থানের অধিবাসিগণ পশ্চিমপারস্থিত কুলিয়ার চরে গিয়া বসবাস করেন এবং সেই স্থানেই কালক্রমে বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহর গড়িয়া উঠে। তাঁহারা আরও বলেন, যে সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল নবদ্বীপ বা নদীয়ায় গঙ্গাবাসের জন্য যে একটি

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন ইহা অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক সত্য। বল্লালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে মায়াপুর হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর গ্রামে বিদ্যমান আছে। প্রাচীন নবদ্বীপের অন্ততঃ একাংশ যে এই স্থানে অবস্থিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থে নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে, উহাতে মায়াপুরের কোন উল্লেখ নাই। তবে প্রাচীন নবদ্বীপ যে বিভিন্ন নামে পরিচিত বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল তাহার উল্লেখ আছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী (বৈষ্ণব নাম ঘনশ্যাম দাস) প্রণীত "ভক্তি রত্নাকর" নামক গ্রন্থে নবদ্বীপ মধ্যবর্ত্তী মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

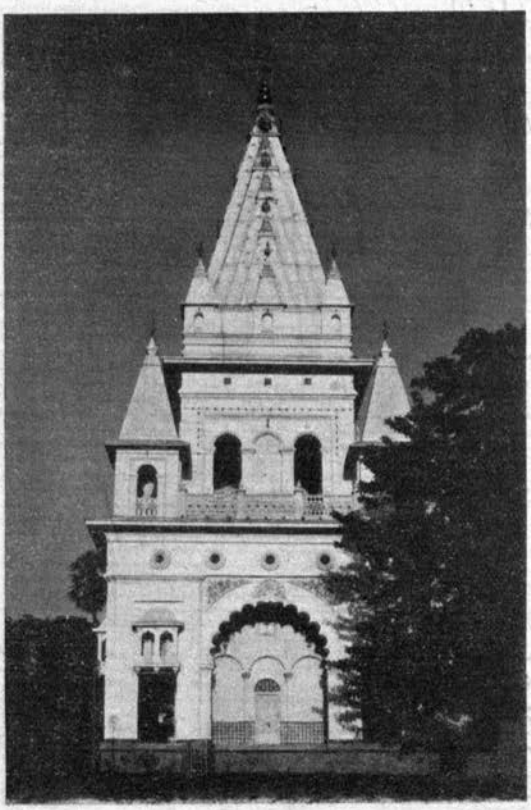
"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

শাস্ত্রমতে ভগবানের আবির্ভাব স্থানকে যোগপীঠ বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব ও পণ্ডিত সমাজের বিশেষ অনুমোদিত। শ্রীচৈতন্য-দেবের সমসাময়িক কাশীর দণ্ডী সমাজের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী (শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত নবনাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী) প্রণীত "নবদ্বীপ শতক" ও জগদানন্দের "প্রেম বিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থে মায়াপুরের সবিশেষ উল্লেখ আছে। ১২৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "কায়স্থ কৌস্তুভ" নামক পুস্তকে "উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র" হইতে ধৃত একটি বচনে মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা "মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।" "নদীয়াকাহিনী" নামক ঐতিহাসিক পুস্তকে ও "বিশ্বকোষ" অভিধানে মায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর পল্লীই যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সে সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমান মায়াপুর যে প্রাচীন মায়াপুর এবিষয়ে তথা প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান লইয়া মত বিরোধের অবসান আজিও হয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা জগন্নাথদাস বাবাজী সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান মায়াপুরের প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রশিষ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময়ই মায়াপুরের সমধিক প্রচার হয় এবং এখানে মঠ মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। বর্ত্তমানে মায়াপুর ক্রমশঃ একটি সুন্দর শহরে পরিণত হইতেছে এবং এখানে বহু দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল নবদ্বীপধামের যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই শহর নবদ্বীপ ও মায়াপুর এই উভয় স্থানই দর্শন করিয়া থাকেন। নিম্নে মায়াপুরের প্রধান দ্রষ্টব্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(ক) **শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির** বা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান :—এই মন্দির খুব উচ্চ ও দেখিতে অতি সুন্দর। রাত্রিকালে ইহার চূড়াসকল বিচিত্রবর্ণ বিদ্যুৎ আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হয় এবং বহু দূর হইতে ইহা দৃষ্টিপথে পড়ে। বাংলাদেশের আর

কোথাও সারা বছর ধরিয়া মন্দির চূড়ায় এই ভাবে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা নাই। এই মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী এবং পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্য্যের বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পার্শ্বে ক্ষেত্রপাল নামক শিবের মন্দির অবস্থিত ও তৎপার্শ্বে নিম্ববৃক্ষতলে শচীমাতার সূতিকা গৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট; ইহাই চৈতন্য দেবের জন্মস্থান বলিয়া এখানে পূজিত হয়।



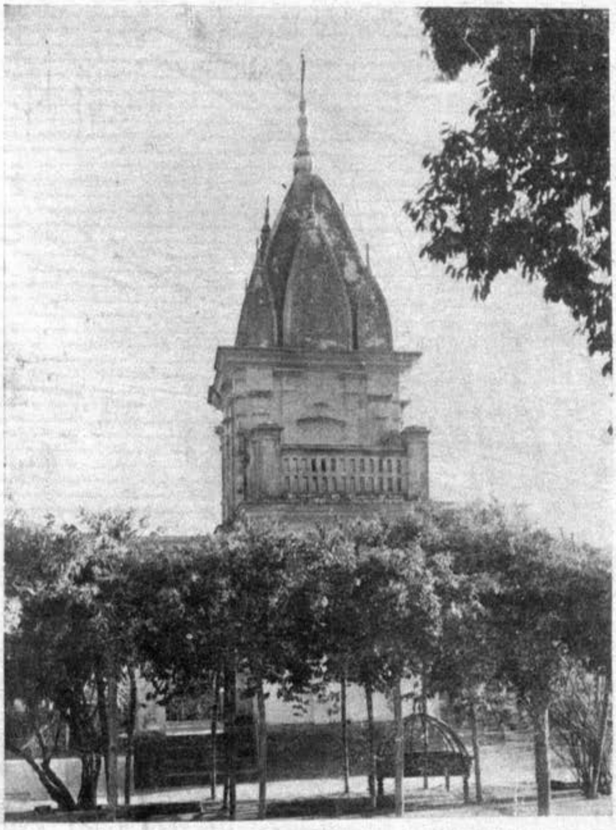
যোগপীঠ মন্দির মায়াপুর

যোগপীঠ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির ও দক্ষিণদিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌সটিট্যুট্ নামক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন দ্বিতল ছাত্রাবাস অবস্থিত।

(খ) যোগপীঠ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" বা শ্রীবাস অঙ্গন অবস্থিত। এখানে ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তনরত গৌর-নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। প্রবাদ, এই স্থানে কাজী সংকীর্ত্তন দলের মৃদঙ্গ বা খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" হয়।

(গ) **শ্রীবাস অঙ্গন** হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরমুখে গেলে পথিপার্শ্বে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌স্‌টিট্যুট্" নামক বৈষ্ণব গবেষণাগার ও **অদ্বৈত ভবন** দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত পথে উত্তরদিকে আর একটু অগ্রসর হইলে গৌড়ীয়-মঠের পূর্ব্বাচার্য্য সরস্বতী মহারাজের ভজনস্থলী "ভক্তি-বিজয় ভবন" ও তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার নিকটেই এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর **শ্রীচৈতন্য মঠ** অবস্থিত। এই মঠটির শিল্প-নৈপুণ্য



শ্রীবাস অঙ্গন মন্দির, মায়াপুর

বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহার মোট উনত্রিশটি চূড়া আছে। মধ্যস্থলের গোলাকৃতি চূড়াটি ও তদুপরি স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠের মধ্যে গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি নিত্য পূজিত হন। ইহার সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ হয়। এই মঠের চারিদিককার চারিটি কক্ষে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় যথা, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ইহার পার্শ্বেই দক্ষিণদিকে **বল্লাল দীঘির** লুপ্তপ্রায়

খাত দৃষ্ট হয়। এই দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব তীরে **মুরারি গুপ্তের ভবন** অবস্থিত। এখানকার মন্দির মধ্যে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। চৈতন্য মঠের নিকটে গৌর-কিশোর দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির ও ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির অবস্থিত। শেষোক্ত মন্দির মধ্যে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি আছে।

(৬) **চাঁদকাজীর সমাধি ও বল্লাল ঢিবি**ঃ—মায়াপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর নামক গ্রামে চাঁদকাজীর সমাধি ও মহারাজ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বল্লাল ঢিবি দৃষ্ট হয়। চাঁদকাজীর প্রকৃত নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন।



চাঁদকাজীর সমাধি, বামনপুকুর

কথিত আছে, তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। এই কাজী প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনে বাধা দেন ও একবার সংকীর্ত্তনকারিগণের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে নগরমধ্যে সংকীর্ত্তন রহিত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক বিরাট সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রার সহিত কাজীর ভবনে গিয়া উপস্থিত হন এবং যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। কাজীর সমাধির উপর প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন একটি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গোলক-চাঁপা ফুলের গাছ আছে। এত বড় ও এত প্রাচীন গোলক-চাঁপা গাছ বড় একটা দেখা যায় না। একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যে এই সমাধিটি অবস্থিত। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সমাধিকে প্রণাম, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। নিকটেই কাজীর প্রাসাদের

ভগ্নাবশেষ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লাল ঢিবিটি প্রায় চারিশত ফুট লম্বা ও ২৫।৩০ ফুট উচ্চ। বর্ত্তমানে ইহা সরকারী রক্ষিত কীর্ত্তি বিভাগের অন্তর্গত। দূর হইতে ঢিবিটিকে একটি পাহাড়ের ন্যায় দেখায়। এই ঢিবি খনন করিলে সেনরাজগণের সময়ের অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই ঢিবি উত্তর-পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকের বহু অংশ গঙ্গা-গর্ভসাৎ হইয়াছে। এই দিকে গঙ্গার একটি জলপূর্ণ খাত এখনও বিদ্যমান আছে। এই ঢিবি হইতে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক আনীত হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখনও এই ঢিবির মধ্যে নানা মাপের ইষ্টক ও প্রস্তর দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক এই স্থান খনন করিয়া কতকগুলি কাঠের বারকোষ, একটি বাক্সে রক্ষিত জীর্ণ শাল ও রেশমী কাপড় এবং কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এই ঢিবিটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

পূর্ব্ব বর্ণিত দ্রষ্টব্যগুলি ছাড়া মায়াপুরে গৌরকুণ্ড, নিতাইকুণ্ড, শ্রীধর অঙ্গন, মহাপ্রভুরঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট, জয়দেবের পাট, শিবের ডোবা প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বর্ত্তমানে মায়াপুর হইতে গঙ্গা প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। তবে এককালে যে গঙ্গা এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা গঙ্গার পরিত্যক্ত খাতসমূহ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মায়াপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর ও যথাক্রমে গঙ্গা ও জলঙ্গী নদী। স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অত্যধিক লোক কোলাহল বিবর্জ্জিত। এখানে গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে তারঘর ও ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" নামক একখানি সংবাদপত্র এই স্থান হইতে বাহির হয়। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে। চৈতন্য মঠে সমাগত অতিথিবর্গকে অন্ন প্রসাদ দানের ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোল পূর্ণিমা) উপলক্ষে গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে শ্রীধাম নবদ্বীপ বা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ পরিক্রমায় বহু ভক্ত যোগদান করেন। সমস্ত বৈষ্ণবপর্ব্বই এখানে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মুড়াগাছা—কলিকাতা হইতে ৭৩ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ রস-সাহিত্যিক ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এই স্থানে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর একটি মন্দির আছে।

দেবগ্রাম—কলিকাতা হইতে ৮৭ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন পল্লী। এই স্থানে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ও উচ্চ ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেন রাজগণের সময়ে এখানে একটি জয়-স্কন্ধাবার বা সেনানিবাস ছিল। পূর্ব্বে

এই স্থান সংস্কৃত চর্চ্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দেবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যেরূপ ভক্ত তেমনই পণ্ডিত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে মথুরা ও বৃন্দাবন বিধ্বস্ত হইবার পর বিশ্বনাথের চেষ্টায় ও দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের সেনাপতি জয়পুররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সাহায্যে উক্ত তীর্থদ্বয়ের লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার হয়। জয়সিংহ বিশ্বনাথের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যের ন্যায় তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। প্রায় একশত বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিশ্বনাথের লোকান্তর ঘটে। বৈষ্ণব সমাজে বিশ্বনাথ কৃত টীকা ও মৌলিক গ্রন্থগুলি বিশেষ আদরের সহিত পঠিত হয়। তাঁহার "সারার্থ দর্শনী" নামে ভাগবতের টীকা "সারার্থ বর্ষিণী" নামে ভগবদ্গীতার টীকা, "সুবোধিনী" নামে অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকা ও তৎ প্রণীত মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত," "চমৎকার চন্দ্রিকা," "প্রেম সম্পুট," "ব্রজরীতি চিন্তামণি" প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ভক্তির পরিচায়ক। তিনি চব্বিশখানি টীকা ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি হরিবল্লভ বা বল্লভ এই ভনিতা দিয়া অনেক সুন্দর পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে বিশ্বনাথের এতদূর প্রভাব ছিল, যে অনেকে তাঁহাকে সুবিখ্যাত রূপ গোস্বামীর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালে বৈষ্ণবপ্রধানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নামের এইরূপ একটি ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ঃ—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যায়াভবৎ ॥"

"সকলকে মহাদেবের ন্যায় ভক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বিশ্বনাথ এবং ভক্তমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করায় ইনি চক্রবর্ত্তী।"

পলাশী—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূর। এ লাইনে ইহাই নদীয়া জেলার শেষ স্টেশন। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ইতিহাস-বিশ্রুত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বহু পলাশ বৃক্ষ থাকায় এই স্থানের নাম হয় পলাশী, কিন্তু বহুকাল হইতে ইহাদের কোন চিহ্নই নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন বৃহস্পতিবার এই স্থানে বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাবাহিনীর সহিত ক্লাইভের অধিনায়কতায় ইংরেজ সৈন্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ কার্য্যতঃ বাংলার আধিপত্য লাভ করেন। মীরজাফর ও দুর্লভরামের অধীনে নবাবের প্রায় ৪৫,০০০ সৈন্য ছিল। কিন্তু ইহারা গোপনে ইংরেজ পক্ষ গ্রহণ করায় যুদ্ধকালে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। ইহার ফলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক নবাবের বিপুল বাহিনী পরাজিত হয়। পলাশী-প্রান্তরবাহিনী ভাগীরথীর তটে একটি ঘন সন্নিবিষ্ট আম্রকুঞ্জের মধ্যে ক্লাইভ শিবির সন্নিবেশ করেন। ইহার অদূরে ভাগীরথীর দুইটি বড় বাঁকের সম্মুখভাগে নবাব বাহিনী অবস্থান করিতে থাকে। নবাব পক্ষীয় সিনফ্রে বা সেন্ট্ ফ্রায়াস্ নামে একজন ফরাসী সেনাপতির অধীন গোলন্দাজ সৈন্য ইংরেজ শিবির লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বপ্রথম গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। সিনফ্রের পশ্চাতে যথাক্রমে সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন বা মীর মর্দ্দান এবং রাজা

মোহনলাল সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। সকাল আটটার সময় প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তিন ঘন্টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে গোলায় গোলায় যুদ্ধ চলিতে থাকে। ক্লাইভ জয়ের আশা সুদূর পরাহত দেখিয়া ইংরেজ সৈন্যকে হটিয়া আসিয়া আম্রকানন মধ্যে অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় নবাবের সমস্ত বারুদ জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়, ইংরেজ পক্ষ নিজেদের বারুদ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইংরেজ সৈন্যকে আম্রকাননে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আম্রকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। সহসা ইংরেজ শিবির হইতে—

"ছুটিল একটি গোলা রক্তিম বরণ।
বিষম লাগিল পায়ে সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মীরমদন পতন॥"

মীরমদনের পতনের পর মহাবীর মোহনলাল সসৈন্যে আম্রকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মীরমদনের পতনের সংবাদ শুনিয়া নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার পদতলে উষ্ণীষ রাখিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আবেদন করেন। মীরজাফর সে দিবস তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধে ভঙ্গ দিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। মোহনলাল ইহাতে প্রথমে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু মীরজাফরের কথায় নবাব কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ আদিষ্ট হইয়া তিনি বিরক্তিসহকারে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। মোহনলাল যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ইংরেজ সৈন্য তাঁহাদিগকে নব বিক্রমে আক্রমণ করে। ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে কাহারও কথায় রণে ভঙ্গ না দিয়া স্বীয় গোলন্দাজ সৈন্যসহ ইংরেজ সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির অধিকার করিল। ইহার পূর্ব্বেই নবাব উষ্ট্রারোহণে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে পলাশীর ইতিহাস বিশ্রুত যুদ্ধের অবসান হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে মাত্র ৭০ জন লোক হত ও আহত হয়। সেই রাত্রিতেই ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত দাদপুর গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং পরদিন প্রাতে মীরজাফর তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিনন্দিত করেন। দাদপুরে নবাবদিগের একটি বাটী ছিল। দাদপুর পলাশীর পরের স্টেশন রেজীনগর হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে।

ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান নদীসাৎ হইয়া এখন চরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণে এখন তেজনগর বা নূতন পলাশী গ্রাম বসিয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী ভ্যালেন্টিন পলাশীর বিখ্যাত আম্রকুঞ্জ দেখিয়াছিলেন। বাগানের শেষ আম্রবৃক্ষটি শুষ্ক হওয়ায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মূলদেশ উৎপাটিত করিয়া পলাশী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পুরাতন আমগাছের আর কোন চিহ্নই নাই। পলাশী পরগণার কিছু অংশ রাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, তিনি এখানে একলাখ আমগাছের বাগান

করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থান লাখবাগ নামেও অভিহিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্তৃক পলাশীর মাঠে শেষ আম্রবৃক্ষটির ৬০।৭০ হাত দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গ্রেনাইট প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় স্তম্ভ ও তাহার নিকটে দর্শকগণের বিশ্রামের জন্য একটি ডাকবাংলা নির্ম্মাণ করেন।

পলাশী হইতে ৪।৫ মাইল এবং পরের স্টেশন রেজীনগরের নিকটে অবস্থিত ফরিদপুর গ্রামের ফরিদতলা নামক স্থানে ফরিদ সাহেব নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধির নিকট সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের সমাধি অবস্থিত। কথিত আছে, মীরমদনের ইচ্ছানুসারেই তাঁহাকে ফরিদ সাহেবের পবিত্র সমাধি ভবনে সমাহিত করা হয়।



মীরমদনের সমাধি, ফরিদতলা

পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সম্বন্ধে তৎকালীন গ্রাম্য কবিগণের রচিত গান আজিও পলাশীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—

"কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলিপড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীর মদনের গায়।
কি হলোরে জান,
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,
কল্‌কেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।

কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটী,
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।"

এরূপ কথিত হয়, যে সিরাজ মহিষী লুৎফউন্নেসা মোহনলালের ভগিনী ছিলেন। বেভারিজ সাহেবেরও এই মত। গ্রাম্য কবি ভগিনীকে বেটী করিয়াছেন। অপর মতে লুৎফউন্নেসা আলিবর্দ্দী-পরিবারে ক্রীতদাসী ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" নামক কাব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত।

পলাশীর স্টেশনের নিকটে একটি প্রকাণ্ড চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

বেলডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ১০৫ মাইল দূর। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানেও একটি চিনির কারখানা আছে।

বহরমপুর কোর্ট—কলিকাতা হইতে ১১৬ মাইল দূর। মীর কাসিমের পতনের পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার নবাবের সৈন্য-সামন্ত কাড়িয়া লইলেন তখন হইতে বহরমপুরের উৎপত্তি। নবাবকে আজ্ঞাধীন রাখিবার জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকট ইংরেজ সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন বোধে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রথম এই স্থানে সেনানিবাস তৈয়ারী হয়। বহরমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে ব্রহ্মপুর হইতে; এখানকার আদি মৌজা বা গ্রামের নাম ব্রহ্মপুর। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে গোরাবারিক্ বা ক্যাণ্টনমেণ্ট নির্ম্মাণ শেষ হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের অবস্থা হীন হইয়া আসিলে সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনানিবাস উঠিয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে মাত্র একটি দেশীয় সেনাদল ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বহরমপুরেই সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। মীরাট ও দিল্লীর পূর্ব্বে বহরমপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু প্রারম্ভেই তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া এখানে কিছু হাঙ্গামা হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর পুনরায় এখানে ইংরেজ সেনাদল রাখা হয়। স্থানীয় দ্বিতল ও একতল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূন্য সেনানিবাস এখন কাছারী এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের বাসস্থান হইয়াছে। বহরমপুরের দক্ষিণদিকে গঙ্গাতীরে অনেকদিন পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি (Agent to the Governor General-এর) বাড়ী ও কাছারী ছিল। এক্ষণে ইহা কলেক্টরের বাটী ও সার্কিট হাউস রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বাটীতে ক্লাইভ কিছু কাল বাস করিয়া ছিলেন বলিয়া কথিত। সেনানিবাসের প্রধান বাজার এখনও গোরাবাজার নামে পরিচিত।

বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমা।

এখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজ স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। ইংরেজ সরকার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজের অনুকরণে এই বৃহৎ ও সুন্দর কলেজ ভবনটি নির্ম্মিত করাইয়া ছিলেন। এরূপ সুদৃশ্য কলেজ বাংলা দেশে অল্পই আছে; ভাগীরথীকূলে অবস্থিত এই সুরম্য কলেজ ভবন ও ইহার ঘড়িঘর বহরমপুরের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সরকার কলেজটির ব্যয়বহনে অসমর্থ হইলে মহারাণী স্বর্ণময়ী উহার ভার গ্রহণ করিয়া কলেজটিকে রক্ষা করেন। প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে এই কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাংলার নানাস্থানের বহু ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ছাত্রাবাস আছে।

রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি সেরিকালচারাল ফার্ম্ এখানে আছে।

বর্ত্তমান বহরমপুর জেলখানা পূর্ব্বে সেনা নিবাসের হাঁসপাতাল ছিল। বহরমপুরের পূর্ব্বদিকে ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গোরা-বাজার হইতে তিন মাইল পূর্ব্বদিকে মাদাপুরে পুরাতন জেলখানা এবং বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের উত্তরে বাবুলবনায় একটি পুরাতন খৃষ্টান গোরস্থান আছে; এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনা নায়ক জর্জ্জ টমাসের সমাধি আছে; টমাস্ নৌবিভাগের কর্ম্ম ছাড়িয়া বেগম সমরু প্রভৃতির অধীনে সেনানায়কের কার্য্য করিয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মালদহের গোয়ালমাটি নীলকুঠির ক্রাইটন সাহেবও এখানে শায়িত; ইনি গৌড়ের ধ্বংস স্তূপ লইয়া বহু অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ ডক্টর রামদাস সেন বহরমপুরের অধিবাসী ছিলেন; বহরমপুরের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। তৎপ্রণীত "ঐতি-হাসিক রহস্য" "ভারত রহস্য" "রত্ন রহস্য" "বুদ্ধদেব চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থ সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত। বহরমপুর কলেজের নিকটে এই মনীষীর প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বনামখ্যাত রাষ্ট্রনৈতিক নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন, "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, টডের "রাজস্থানের" বঙ্গানুবাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিখ্যাত ঐতি-হাসিক নিখিলনাথ রায়ের নামও বহরমপুর প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নিখিলনাথ রায়ের ঐতিহাসিক চিত্র "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" বাংলা ভাষার একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

এই বহরমপুরেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বাংলা তারিখ সন্ ১৩১৫ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক অনুষ্ঠিত হয়।

বহরমপুর হইতে এক মাইল দক্ষিণে চালতিয়া-মালতিয়া গ্রামে প্রতিবৎসর ৯ই চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামের পূজা উপলক্ষে প্রায় এক মাস ব্যাপী একটি মেলা বসে।

বহরমপুর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে রাঙ্গামাটির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসা যায়। পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "চিরতী" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

বহরমপুর জেলখানার উত্তরে খাগড়া বাজার; ইহা রেশমী কাপড় ও কাঁসার বাসনের জন্য সমগ্র বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ। খাগড়া বহরমপুরেরই অংশ বিশেষ।

মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তের শিল্পের কথা সুপ্রসিদ্ধ; এক কালে এই শিল্পীরা ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন; কিন্তু এখন লোকের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শিল্প-ধারাটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। খাগড়ায় চিরকালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের বাস ছিল; এখন মাত্র দু এক ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। মাথরা, দৌলতবাজার প্রভৃতি গ্রামে এখন আর কোনও শিল্পী দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের এই শিল্পের বিশেষত্ব হইতেছে অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কাজ। ইহার জন্য প্রায় ৭০|৮০ রকমের বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। নানা রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি, জন্তু জানোয়ার, গরুর গাড়ী, নৌকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি হাতীর দাঁত সম্পূর্ণ কুঁদিয়া বাহির করা হয়; শিল্পীরা জোড় দেওয়া মোটেই পছন্দ করেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবী আমল হইতে এই শিল্পের উৎপত্তি; কথিত আছে প্রথমে দিল্লী হইতে একজন শিল্পীকে লইয়া আসা হয়; তিনি যখন দরজা বন্ধ বরিয়া কাজ করিতেন, তখন একজন হিন্দু ভাস্কর লুকাইয়া দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া দেখিয়া ইহা শিখিয়া লন এবং তাঁর পুত্র তুলসীকে ইহা শিখাইয়া দেন; কথিত আছে তুলসী অতি সুদক্ষ শিল্পী হইয়া উঠেন। একবার তীর্থ করিয়া ১৭ বৎসর পরে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলে নবাবের আদেশে স্মৃতি হইতে পূর্ব্বেকার নবাবের একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন; পূর্ব্বতন নবাবের সহিত মূর্ত্তিটির আশ্চর্য্য রকম সৌসাদৃশ্য দেখিয়া নবাব প্রীত হইয়া তাঁহাকে গত ১৭ বৎসরের পুরা মাহিনা এবং একটি বাটী প্রদান করেন। এখনও তুলসীর নাম উঠিলে শিল্পীরা তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন।

খাগড়ার অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া লুপ শাখার খাগড়াঘাট রোড্ স্টেশন অবস্থিত। এই স্টেশনের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বহরমপুর-খাগড়ার অপর পারে ভৃঙ্গেশ্বর মন্দিরের নিকট ভীমের গদা নামে প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি বৌদ্ধযুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

খাগড়ার ঠিক উত্তরেই ভাগীরথী কূলে সৈয়দাবাদ; পূর্ব্বে ইহা কাশীমবাজারের শহরতলী বলিয়া গণ্য হইত। এখানে ফরাসীদিগের কুঠি ছিল; ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর হইতে একদল ফরাসী এখানে আসিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ ডুপ্লে (Dupleix) কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত ফরাসী কুঠির মনোমালিন্য হইলে নবাব সৈন্য কুঠি পরিবেষ্টিত করে এবং ফরাসীগণকে ৫০ হাজার সিক্কা টাকা দিয়া নবাবকে তুষ্ট করিতে হয়। ক্রমে ইংরেজ বণিকদিগের সহিত বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় ফরাসীরা হটিয়া যান। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধিলে বহরমপুরের ইংরেজ সেনা নায়ক ফরাসী কুঠি অধিকার করিয়া লন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদ লালবাগ পর্য্যন্ত নদী তীর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে ফরাসী কুঠিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; ইহার চিহ্নমাত্র যদিও এখন আর নাই স্থানটি এখনও ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত। বহরমপুরের জলের কল ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিত।

সৈয়দাবাদে ফরাসীদিগের আবাস স্থান বা **ফরাসডাঙ্গার** পূর্ব্বদিকে আর্মেনীয় বণিকগণের বাস ছিল। তাঁহার ফরাসীদিগের পূর্ব্বে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহারা সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে একখণ্ড ভূমির সনন্দ পাইয়া তাঁহাদের গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দাবাদের যে অংশে আর্মেনীয়গণ বাস করিতেন তাহা শ্বেতাখাঁর বাজার নামে পরিচিত ছিল; আর্মেনীয়গণ এসিয়াবাসিগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌর বা শ্বেতবর্ণ হওয়ায় তাঁহারা শ্বেতা খাঁ নামে অভিহিত হইতেন। **শ্বেতাখাঁর বাজার** এখন **আমানিগঞ্জ** (আর্মানীগঞ্জ) নামে পরিচিত। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন আর্মেনীয় গির্জাটির পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান সুবৃহৎ **আর্মেনীয় গির্জাটি** নিৰ্ম্মিত হয়। এ সময়ে বহু আর্মেনীয় বণিক সৈয়দাবাদে বাস করিতেন। পূর্ব্বে আর্মেনীয়া হইতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নূতন পুরোহিত আনয়ন করা হইত। এখনও এখানে একটি আর্মেনীয় পুরোহিত পরিবার গির্জাটির তত্ত্বাবধান করেন। গির্জার প্রাঙ্গনে অনেক সমাধিতে আর্মেনীয় ভাষায় লিখিত ফলক দৃষ্ট হয়। এই গির্জাটি সৈয়দাবাদের একটি দেখিবার জিনিষ। আমানিগঞ্জের অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে খোশবাগ অবস্থিত; মুর্শিদাবাদ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত কবিরাজ হরিরামাচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্য্যের বংশধরগণের গৃহে বহুদিন হইতে কৃষ্ণরায় ও মোহন রায়ের বিগ্রহ পূজিত হইতেছে। সৈয়দাবাদের অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বুঁধুই পাড়া গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা ঠাকুরঝির সহিত শ্রীনিবাসের ভক্ত শিষ্য রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভের বিবাহ হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দুই পৌত্র রাধামাধব ঠাকুর ও সুবলচন্দ্র ঠাকুর এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সুবলচন্দ্র তাঁহার পিসীমা হেমলতা ঠাকুরঝির মন্ত্র শিষ্য। এই সুবলচন্দ্রের শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার মালিহাটী বা মেলেটি গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ পদ কর্ত্তা যদুনন্দন দাস হেমলতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশাবলী ও শিষ্য সম্প্রদায় বিষয়ক একখানি পদ্য গ্রন্থ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে বুঁধুইপাড়ায় সমাপ্ত করেন। হেমলতা এই গ্রন্থের নাম দেন "কর্ণানন্দ"; বৈষ্ণব সমাজের তদানীন্তন ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়। যদুনন্দন আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সৈয়দাবাদের পূর্ব্বাংশ **কুঞ্জঘাটায়** নবাব মীরজাফরের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমার রায়ের একটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন বাড়ী বর্ত্তমান আছে। তাঁহার এক দৌহিত্রের বংশধরেরা এখানে বাস করিতেছেন; ইহারা কুঞ্জঘাটার রাজবংশ নামে পরিচিত। কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে মহারাজা নন্দকুমারের আমলের বহু পুরাতন দলিলপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে পুরীধামে ভক্তগণ বেষ্টিত শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি অতি সুন্দর প্রাচীন তৈল চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহা নিয়মিত ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়া থাকে। কথিত আছে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে ওড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র দেবের আদেশে ইহা অঙ্কিত হয়। তৎকালের বৈষ্ণব ভক্তগণের মতে চৈতন্যদেবের সহিত এই চিত্রের বিশেষ মিল আছে। পুরাতন হইলেও ছবিটি দেখিলে নূতন আঁকা বলিয়া ভ্রম হয়। মহারাজ নন্দকুমার চিত্রখানি তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রাধামোহন ঠাকুরের

নিকট হইতে উপহার লাভ করেন। কথিত আছে, একবার নন্দকুমার বঙ্গের নানাস্থান হইতে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পদধূলি সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়াছিলেন। এই ধূলি কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে এখনও রক্ষিত আছে।

নন্দকুমারের পৈতৃক নিবাস ছিল বীরভূম জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর বা ভাতুর গ্রামে। এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার জন্ম ভবন এখনও দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া নন্দকুমার নির্ম্মিত দেওয়ান খানা আছে। নন্দকুমারের পিতা মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিতেন। বাল্যকাল হইতে নন্দকুমার পিতার সহিত থাকিয়া এই কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করেন এবং প্রথমে আমিনী কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলার নবাব মীরজাফরের দেওয়ানের পদ পর্য্যন্ত লাভ করেন। মীরজাফর তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। তিনিই দিল্লীর বাদশাহকে অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারকে মহারাজা উপাধি প্রদান করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কার্য্যতঃ এ দেশের অধিকার লাভ করিলে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত নন্দকুমারের ভীষণ মনোমালিন্য হয়। পরে তিনি কিরূপে জাল করার অপরাধে অপরাধী গণ্য হইয়া তৎকালীন ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই অবগত আছেন। নন্দকুমারের অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার কথা তাঁহার শত্রুপক্ষও স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র নৈতিক ব্যাপারে ভারতীয়গণের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন ; এই জন্য তিনি "কালা কর্ণেল" আখ্যা পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার ফাঁসী হইলে বহু লোক ব্রহ্মহত্যার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশে চারিদিকে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত গ্রাম্য গীতি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

মহারাজ নন্দকুমার রে
তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলিরে
নন্দকুমার রায় ছিল বাংলার অধিকারী।
হেষ্টিং সাহেব এলো জান্ করিবারে বারি ॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোহারাতে হাঁস
যোড় বাংলায় কাঁদে সোনার গুল্‌তে বাঁশ।
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণী গো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিঁদুর বঞ্চিত করলেন বিধি ॥

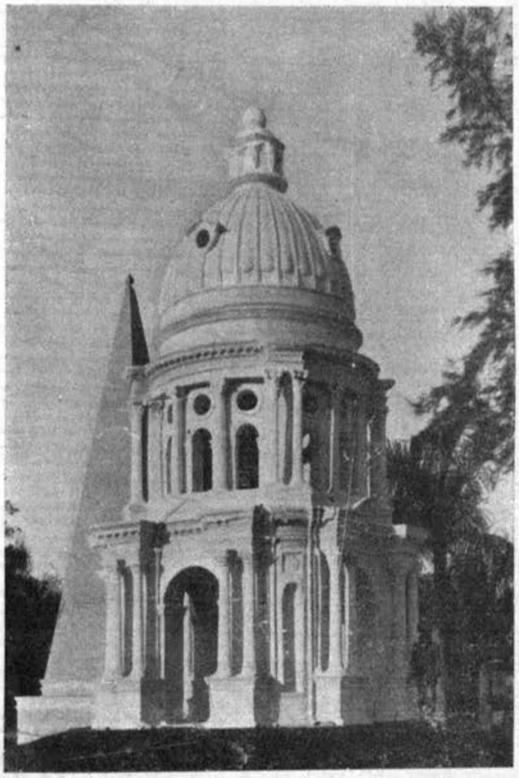
(মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

এই গ্রাম্য গীতে দুইটি রাণীর কথা থাকিলেও তাঁহার এক পত্নী ক্ষেমঙ্করীর কথাই শুধু জানা যায়। নন্দকুমারের একমাত্র পুত্র রাজা গুরুদাস গৌড়াধিপতি উপাধি পাইয়াছিলেন। কলিকাতার বীডন উদ্যানের নিকট রাজা গুরুদাসের নামে একটি রাস্তা এখনও আছে। কলিকাতায় নন্দকুমারের আবাস বাটীর স্থলেই বীডন উদ্যান হইয়াছে।

কাশীমবাজার—কলিকাতা হইতে ১১৮ মাইল দূর। এই স্থান বহরমপুরের উত্তরে ও সৈয়দাবাদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই কাশীমবাজার বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পূর্ব্বে ইহার পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরের মধ্যে তৎকালে একটি বড় বাঁক ছিল এবং বহরমপুর হইতে নৌকা যোগে মুর্শিদাবাদ যাইতে প্রায় একদিন লাগিত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি খাল কাটিয়া এই বাঁকের দুই প্রান্ত সংলগ্ন করিবার ফলে, সেই খাল দিয়াই ভাগীরথীর প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে এবং ফলে বড় বাঁকটি একটি বাওড় বা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। এই কারণেই ভীষণ ব্যাধির প্রকোপে বাঁকের উপর অবস্থিত কাশীমবাজার প্রভৃতি বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বাঁকের উপর কাশীমবাজারে ইংরেজদিগের, কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের, সৈয়দাবাদের শ্বেতাখাঁর বাজারে (বর্ত্তমান নাম আমানিগঞ্জ) আর্ম্মেনীয়দিগের ও সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের বাণিজ্য কুঠি অবস্থিত ছিল। কাশীমবাজার ও নিকটবর্ত্তী এই সকল স্থানে তৎকালে রেশমের বিস্তৃত কারবার ছিল। কথিত আছে, যে কাশীমবাজারের সমৃদ্ধির সময় এখানে এত অধিকসংখ্যক ঘন সন্নিবিষ্ট অট্টালিকা ছিল যে লোকে পর পর ছাদের উপর দিয়া দুই তিন ক্রোশের উপর চলিয়া যাইতে পারিত। ইংরেজগণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। সেই সময়ে ওয়াটস্ সাহেব কুঠির রেসিডেণ্ট্ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। উভয়েই বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০০ টাকা বেতনে কাশীমবাজার কুঠির সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। সপ্তগ্রামের পতনের পর ও কলিকাতার উত্থানের পূর্ব্বে কাশীমবাজার বাংলার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সে সময়ে পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড কাশীমবাজার দ্বীপ নামে কথিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইলে কাশীমবাজারের বাণিজ্য গৌরব বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। কাশীমবাজারই মুর্শিদাবাদ-রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। নানা রকমের রেশমী কাপড় এখানে প্রস্তুত হইত। ইউরোপের জন্য গাউনপিস্ কোড়া, অসমীয়া মহিলাদিগের জন্য মেঘলা ও রিয়া, ব্রহ্মদেশীয়দিগের জন্য ফুলিকাট্ চেক্, বাংলা ও আরব দেশের জন্য বিভিন্ন নমুনার রেথী, ধারী ও চারখানা, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের জন্য মটকা ও চেলীর ধুতি ও শাড়ী, বাংলার জন্য শাদা রেশমের তাজপাড়, কল্‌কাপাড়, পদ্মপাড়, ভোমরাপাড় শাড়ী, ধানী, কট্‌কাপাড়, ফিতাপাড়, ঘুন্‌সীপাড়, চুড়িপাড় ধুতি, বালুচর বুটীদার শাড়ী, উত্তর ভারতের জন্য নানা রকম চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

বর্ত্তমানে কাশীমবাজারের পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। ভাগীরথীর মজিয়া যাওয়া বাওড়ের ধারে ইংরেজ রেসিডেন্সীর ভগ্নাবশেষ ও পার্শ্বে একটি সমাধিস্থান

বিদ্যমান। উহাতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী ও শিশুকন্যা এলিজাবেথের সমাধি আছে। তাহা ছাড়া লেফটন্যাণ্ট্ কর্ণেল জন্ ম্যাটকের পত্নী সুবিখ্যাত ক্রমওয়েলের পিস্‌তুতো ভাই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জননায়ক জন্ হ্যামডেনের নাতনী বলিয়া বর্ণিত সারা ম্যাটকের সমাধি আছে। রেসিডেন্সী সমাধির কিছু পশ্চিমে কাশীমবাজার স্টেশনের ঠিক্ উত্তরেই কালিকাপুরের ওলন্দাজ সমাধি ক্ষেত্রটি অবস্থিত। ইহাতে কতকগুলি সমাধি স্তম্ভ ও একটি উচ্চ সৌধ আছে। দুইটি সমাধি ক্ষেত্রই সরকারী "রক্ষিত-কীর্ত্তি"



ওলন্দাজ কবরখানা, কালিকাপুর

বিভাগের অধীন। কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের কুঠি, দুর্গ বা গির্জ্জার কোন চিহ্নই আর নাই। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কালিকাপুর কুঠি দখল করেন। কালিকাপুরের পশ্চিমে সৈয়দাবাদ অবস্থিত।

কাশীমবাজারের পুরাকীর্ত্তির মধ্যে মহাজন টুলি নামক মহল্লায় জৈন বণিকগণের **নেমিনাথ মন্দির** আজিও সুসংস্কৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরটি বহু পুরাতন। মন্দিরের মধ্যে নেমিনাথ, পরেশনাথ (পার্শ্বনাথ) প্রভৃতি চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে। নেমিনাথের মূর্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সর্ব্বোচ্চ আসনে রক্ষিত।